জাতীয়তাবাদ
ও
বাংলাদেশ

শ্রীমতিলাল সাহা

প্রাপ্তিস্থান :—

১। কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র
২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। কংগ্রেস পুস্তক বিপণি
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার আগামীদিনের শহীদদিগের আহ্বানে

"এখনও বহু বাধা হইতে হবে পার
আত্ম-কলহের বিষম পারাবার.

* *

এখনও বহু প্রাণ চাই যে বলিদান—
রাখিতে মা'র মান স্বাগত বীরদল ॥"

সূচী

সংকলকের নিবেদন

বর্তমান পুস্তকখানি লেখকের গত কয়েক মাসের কতকগুলি চিঠি হ'তে সংকলিত। চিঠিগুলি হ'তে নিছক ব্যক্তিগত ও এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়ে এব বিষয়বস্তু সংগৃহীত। তা হলেও এ বই পুরাপুরিই লেখকের নিজের হাতের। কেবল স্থান বিশেষে পাদটীকা পূরণ করা ব্যতীত আর কিছুই আমাকে যোগ-বিয়োগ করতে হয় নাই। আমার কাজ হয়েছে শুধু বেছে বেছে বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র করা লেখকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও,—এবং অনিচ্ছুকের কাছে অনুরোধ ক'রে তার নোটবই হ'তে প্রমাণ সংগ্রহ ও পাদটীকায় উদ্ধৃত করা।

চিঠিগুলি লেখা আমাদের জীবনের পরম শুভক্ষণে—প্রীতি ও পূর্ণতার লগ্নে। কিন্তু সে আনন্দ উপভোগ করতে হয়েছে করুণ পরিবেশে—জাতীয় জীবনে বেদনাভরা বিপর্যয়ের মাঝে। বাঙালী জাতির এ বিপর্যয়ে রুদ্ধ বেদনার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে চিঠিগুলিতে এবং ইহা অবসানের জন্য আভাসে পথ নির্দেশের ইঙ্গিতও রয়েছে এ ক'য় ছত্রে।

লেখকের নিজের কথায় "বাংলার স্বার্থ, বাংলার ঐতিহ্য ও বাংলার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলিয়া বাঙ্গালী আজ উন্মত্ত উল্লাসে শ্মশান-যাত্রী। কবে কি উদ্দেশ্যে পুরাণকার ছিন্নমস্তার কল্পনা করিয়াছিলেন জানা নাই। কিন্তু বাঙ্গালী আজ ছিন্ন-মস্তা সাজিয়া আপন রুধির পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চারিদিকে পিশাচের দল খল্‌খল্ হাসিতেছে আর উন্মাদ-অট্টহাস্যে শ্মশান-শিবার ডাকে জাতি শবযাত্রা করিয়াছে।" বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই মহা-শ্মশানে শিবের আবির্ভাব হোক, এই আকুলতা নিয়ে এ সংকলন প্রকাশ করা হ'ল।

নৈহাটী—২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫৪
(১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭)

প্রতিভারাণী সাহা।

জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ

১। জাতীয়তার দিগ্বিজয়।

সারা এশিয়াময় আজ জাতীয়তার আন্দোলন পরিব্যাপ্ত। বিংশ শতাব্দীর এশিয়ার ইতিহাস জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বলিলে অতিরঞ্জন হয় না। তুরস্ক, ইরান, ফিলিস্তিন, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, মালয়, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, হিন্দুচীন, চীন, জাপান ও মাঞ্চুকুয়োর ইতিহাসের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছু নাই। এশিয়ার সকল দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, শিল্প ও ললিতকলার প্রতি ছত্রে প্রতি রন্ধ্রে আজ জাতীয়তার লড়াই প্রতিফলিত হয়। জাতীয়তার সংগ্রাম ব্যতীত এশিয়ার কোন দেশের খবর নাই, অস্তিত্ব নাই।

জাতীয়তার উৎপত্তি য়ুরোপের খৃষ্টীয় ধর্মরাজ্য (Christendom) বিলোপের সাথে হইলেও প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব মাত্র দুইশ' বছরের। ইহার মধ্যে সমাজ বিবর্তনের ভিতর দিয়া সারা দুনিয়াময় জাতীয়তাবাদ এক বৈপ্লবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। য়ুরোপের 'নবজাগরণের' (Renaissance) পর খৃষ্টীয় ধর্মরাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ায় কতকগুলি রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলেও জাতীয়তায় সংগঠন সমর্থ য়ুরোপের অসংখ্য মানবগোষ্ঠী দিশেহারা হইয়া পড়ে এবং নানাভাবে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের আওতায় পীড়িত হইতে থাকে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ শুধু যে রাজা লুইয়ের জবরদস্ত রাষ্ট্র পরিচালনা ও নেপোলিয়নের রাষ্ট্র বিস্তারের ভিতর দিয়া প্রকট হয় তাহা নহে। ফরাসী ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য য়ুরোপের অভিজাত শ্রেণীকে মোহগ্রস্ত করিয়া প্রকৃত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ

বাধে। তেমনি উত্তর ও পূর্বে রুশ সাম্রাজ্য (রুশ সাহিত্য প্রবল না হইলেও জারের অধীনস্থ জাতিগুলির পক্ষে স্ব স্ব ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করা সম্ভব ছিল না) এবং দক্ষিণে লাটীন সাম্রাজ্য জাতীয়তা বিস্তারে বাধা দেয়। গ্রীক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রিক মূল্য না থাকিলেও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য হিসাবে উহা ছিল জাতীয় সত্ত্বা বিকাশের প্রতিকূল। খৃষ্টীয় ধর্মরাজ্য বিলুপ্ত হইলেও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে পোপ, লুই, হেনরী, জার, কাইজার, স্পেন ও অষ্ট্রিয়ার জবরদস্ত শাসন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লাটীন, ফরাসী ও গ্রীক সাহিত্য জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়। য়ুরোপের রেনেসাঁসে তাই জাতীয়তাবাদ আসে না।

জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রকাশ হয় পোলিশ ও জার্মাণ রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া। এই হিসাবে জার্মাণ হার্ডারকে (১৭৭৪—১৮০৩) জাতীয়তাবাদের আদি ঋষি বলা চলে। হার্ডারই সর্বপ্রথমে জার্মাণ জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন এবং জার্মাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ফরাসী, লাটীন ও গ্রীক সংস্কৃতির দাসত্ব মুক্ত করিবার জন্য আজীবন সাধনা করেন। জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রচারক হইলেও হার্ডার কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনা করেন নাই এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই। অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাষায় "হার্ডার প্রধানত 'অ রাষ্ট্রিক'।" জার্মাণদের ভাষা, জার্মাণ জনগণের (volk) সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, জার্মাণ জাতির ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ গৌরবময় বিকাশের সম্ভাব্যতা এবং জার্মাণ জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা

. দিলীপ কুমার মালাকারের 'জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডার,' পুস্তিকায় অধ্যাপক সরকারের ভূমিকা—।।• পৃষ্ঠা।

—ইহাই ছিল হার্ডারের জাতীয়তাবাদের মূল বিষয়। কিন্তু ইহার জন্য হার্ডার রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা করেন নাই বা প্রচলিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব ঘোষণার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

হার্ডারের এই 'অ-রাষ্ট্রিক' জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রিকতার ভিত্তিতে বাস্তব রূপ পায় বিস্‌মার্কের (১৮১৫—৯৪) হাতে। হার্ডারকে যদি জাতীয়তার বাণীমূর্তি বলা চলে তবে বিস্‌মার্ককে বলা উচিত জাতীয়তার কর্মমূর্তি। জার্মাণ জাতিকে একত্র করা—এক রাষ্ট্রের আওতায় আনিয়া জার্মাণ জাতির জীবনে মরণে এক সত্ত্বায় উদ্বুদ্ধ করা এবং জার্মাণ জাতির গৌরবময় বিকাশের সহায়ক এক জার্মাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল বিস্‌মার্কের জীবনের সাধনা। হার্ডার-বিস্‌মার্ক্‌এর একত্র সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পোলিশ জাতীয়তাবাদ সুরুতেই একটা রাষ্ট্রিক আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অষ্ট্রো-হাঙ্গারী ও জারের সাম্রাজ্য পোল জাতিকে ভাগাভাগি করিয়া গ্রাস করার পর হইতে এই জাতীয়তা-বাদের উদ্ভব এবং স্বতন্ত্র পোল রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যই এই আন্দোলন। সাম্রাজ্যের জবরদস্ত অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য এই রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী এবং এই দাবীর ভিত্তিতেই পোলিশ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। হার্ডারের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক চিন্তা পোলিশ জাতীয়তায় সমাদর পায় নাই। এই জাতীয়তার প্রেরণা আসিয়াছে "রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জবরদস্ত দার্শনিক" ফিক্‌টে-এর (১৭৬২—১৮১৪) নিকট হইতে। রাষ্ট্রের সীমানির্দেশ ছিল এই জাতীয়তাবাদের মূল নিয়ন্তা। জার্মাণ জাতীয়তায় মুখ্য যেখানে জাতি (volk) পোলিশ জাতীয়তায় প্রধান সেখানে ভূমি (land)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও পোলিশ সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়*
"The territory (to the east of the Odre) is Polish despite long years of Germanisation ....The territories which are of insignificance and, before the war, of decreasing value to German economy are absolutely vital to Poland's rehabilitation............Poland has already demonstrated an immense and successful effort in assimilating these lands"

[(ওডার নদীর পূর্বের) ভূমিগুলি দীর্ঘদিনের জার্মাণীকরণ সত্ত্বেও পোলিশ। জার্মাণ আর্থিক ব্যবস্থায় নগণ্য এই সকল জমি পোলাণ্ডের পুনর্বসতির জন্য অপরিহার্য। পোলাণ্ড এগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য ইতিমধ্যেই প্রভূত প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে।]

এই বিবৃতিতে পোলিশ জাতীয় দাবীর প্রতিপদে ভূমির (land বা territories) উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। land বা ভূমির উপর তোল অর্থাৎ লক্ষ্য হওয়ায় পোলিশ জাতীয়তাবাদ সংস্কৃতিক্ষেত্রে জাতির জন্য সমুচ্চ কোন আদর্শ স্থাপন করে নাই এবং এই জাতীয়তাবাদ সারা দুনিয়ার মানব জাতির অগ্রগতিতে সামান্যই প্রেরণা দিয়াছে।

হার্ডার-বিসমার্কের জাতীয়তাবাদ পৃথিবীতে একটা বিশেষ শক্তিশালী মন্ত্র সৃষ্টি করে। জার্মাণ জাতির গৌরবময় ভবিষ্যৎ, জার্মাণ সংস্কৃতির মুক্তি ও আত্মবিকাশ, জার্মাণ জাতির সংহতি, সংগঠন,

---

* পোলিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ভিক্টর গ্রোৎসে (Victor Groz) এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করেন, এবং উহার উদ্বোধনে এই সরকারী বিবৃতি পাঠ করা হয়। সংবাদদাতা—অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ—মস্কো—১০ই এপ্রিল—১৯৪৭।

এবং জার্মাণ জাতির জন্য এক-রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব স্থাপন ও প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিবোধ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা এক নূতন শক্তির উন্মেষ করে। এই শক্তির আধার সমগ্র মানবজাতি। এই শক্তি আজ সারা এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত।

(২)

য়ুরোপের এই জাতীয়তাবাদ শীঘ্রই বিপথগামী হইয়া পড়ে। জার্মাণ সংগঠন ও জার্মাণ সংস্কৃতি বিস্তারের নামে বিস্‌মার্ক্ স্বপ্ন দেখেন সাম্রাজ্য স্থাপনের। সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাগর পারের বাণিজ্যে অপর দেশ শোষণ ইতিমধ্যেই য়ুরোপে রপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গ ও কর্ণাট বিজয় এবং ভারতের ধনরত্ন ও সম্পদ লুণ্ঠন, আর সেই সঙ্গে বিলাতের শিল্প-বিপ্লব ছার্ডারের সমসাময়িক, কিন্তু বিস্‌মার্কের পূর্ববর্তী ঘটনা। সাগরপারে উপনিবেশ স্থাপন ও বহির্বাণিজ্যে সাম্রাজ্য পোষণের ফলে বৃটেন, হলাণ্ড্, বেলজিয়াম, ফ্রান্স্, স্পেন ও পর্তুগাল কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃটেনের ঐশ্বর্য ও লোকবল বৃদ্ধি পায় অভাবনীয়রূপে, সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে শিল্প বিপ্লব সাধনের ফলে। নবীন শিল্প-বিপ্লব এত সম্পদ ও শক্তির আধার হয় যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বৃটেন সমগ্র য়ুরোপে প্রাধান্য লাভ করে এবং সমগ্রভাবে পশ্চিম য়ুরোপীয় শক্তি কয়েকটি সমস্ত পৃথিবী দখল করিয়া বসে। তাই একদিকে বিলাতের জাতীয়তার মন্ত্র হয়, "Rule Britannia, Britannia rules the waves" (ব্রিটানিয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর) এবং অপর দিকে য়ুরোপের সকল দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদীর আভিজাত্যের বুলি হয়—সকল অশ্বেত দুনিয়া শ্বেত জাতির বোঝা ('whitemen's burden'.) এইভাবে একদিকে প্রতিযোগিতায় সমধর্মী সাম্রাজ্যলিপ্সুর উপর

প্রাধান্য লাভ এবং অন্যদিকে বর্ণবৈষম্যে বিশেষ আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার—এই দুই ধারায় জাতীয়তাবাদের গতি প্রবাহিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মাণী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে। এই জাতীয়তাবাদের মূল ছিল বিজাতি-বিদ্বেষ। ইহা অন্য দেশে যুদ্ধ, নরহত্যা ও লুণ্ঠনের প্রেরণা দিয়াছে এবং ইহাই মূলত হিটলারের "হেরেনফোক্" (Herrenvolk) বা "শ্রেষ্ঠজাতি" তত্ত্ব।

এই বিকৃত জাতীয়তাবাদ আসলে সাম্রাজ্যবাদ বা শোষণ তন্ত্রের ছদ্মনাম। ইহার মধ্যে স্বজাতি-বাৎসল্য নাই। শিল্পপতি ও স্থিত-স্বার্থ মিলিয়া যাহাতে সাম্রাজ্য হইতে শোষিত অর্থ নিজেদের নির্দিষ্ট আওতায় সংরক্ষিত রাখিতে পারে, দেশের অগণিত মজদুর ও জনসাধারণকে যাহাতে ইহার ভাগ দিতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই জাতীয়তাবাদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জাতীয়তাবাদ বনাম শোষণ তত্ত্ব স্বদেশের জনসাধারণকে সর্বহারা দিনমজুরে পরিণত করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকারের দাবী রোধ করিবার জন্য অপর দেশের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া তাহাদেরই রক্তে ধরণী সিক্ত করিয়াছে। এই জাতীয়তাবাদ স্বদেশে ও অধিকৃত দেশে মানব জাতিকে কোন আশার বাণী শুনাইতে পারে নাই এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারকও হইতে পারে নাই। মানুষের আত্মার অবমাননা ও মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের বিস্তারে বাধা দিয়া উহা জগতে তমোগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। জাতীয়তাবাদী চার্চিল আর জাতীয়তাবাদী হিটলার তাই বিশ্বের বিভীষিকা।

হার্ডারের জাতীয়তার স্বরূপ কিন্তু ইহা ছিল না। জার্মাণ-জাতীয়তাবাদী হইলেও হার্ডার ছিলেন বিশ্বের জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত। তিনি ছিলেন স্বজাতি-বৎসল, বিজাতি-বিদ্বেষী নহে।

জাতীয়তাবাদী হার্ডার তাই বিশ্বের প্রেরণা। হার্ডার ছোটলোকের দরদী মন্ত্রদাতা ঋষি। হার্ডারের ফোক (volk) জার্মান জাতির নিপীড়িত নিগৃহীত অবমানিত ছোটলোক সমাজ। ইহাদিগকেই সংগঠিত করিবার আশায় তিনি জার্মাণ সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। হার্ডারের এই বাণী প্রতিফলিত হইয়াছে ফিক্‌টের ঘোষণায় "the meanest slave is the temple of the Holy Ghost" (দীনতম দাসও পরমাত্মার মন্দির); এবং উহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বিবেকানন্দের "দরিদ্রনারায়ণে"। হার্ডার-ফিক্টের 'লোক' তত্ত্ব (volk) মানবের শাশ্বতকালের প্রেমসঙ্গীত এবং উহারই বিকৃতরূপ বিসমার্ক-ডিস্‌রেলি ও হিট্‌লার-চার্চিলের হেরেনফোক তত্ত্ব (herrenvolk) নিত্যকালে মানবের সুলালিত সংস্কৃতির উপর দানবের দাপট।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় তিন প্রকারের সংগ্রাম উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদিগণের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারার সংগ্রাম; দ্বিতীয়ত, অধিকৃত দেশে জাতীয়তাবাদের উত্থানে সাম্রাজ্য শোষণের বিরোধী সংগ্রাম; এবং তৃতীয়ত, সাম্রাজ্য-বাদীর দেশে স্থিতস্বার্থের সহিত সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রাম।

শোষক হিসাবে সকল সাম্রাজ্যবাদীই মূলত এক। পরস্বাপহরণ ও পরদেশ লুণ্ঠন করে ইহারা দল বাঁধিয়া। কিন্তু আপন প্রভুত্ব পরায়ণতার জন্য তাহারা পরশ্রীকাতর ও বিদ্বেষ পরায়ণ। কাজেই একজনের বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধিতে বিরোধিতা করা তাহাদের স্বাভাবিক। এইভাবে কাড়াকাড়িতে যুদ্ধ বিগ্রহ সুরু হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় শক্তিগুলির বিস্তার প্রচেষ্টা এবং যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ এই কারণেই ঘটে। এমন কি বিংশ শতাব্দীর দুইটী মহাসমরও মূলত এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুধু যে বাণিজ্যিক স্বার্থান্বেষীর দল নিজেরা লিপ্ত হইয়াছে তাহা নহে। বরং নানান ছদ্ম ভাঁওতায় স্বদেশের জনগণকে তাহারা বাধ্য করিয়াছে নরমেধ যজ্ঞে, আর সেই যজ্ঞের ভূমি ও বলি হইয়াছে বণিকের শোষণক্ষেত্র বা উপনিবেশ ও অধিকৃত দেশগুলি। বৃটেন ও ফ্রান্সের শতাব্দীব্যাপী লড়াই আর জার্মাণীর ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম মহাসমর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই স্বার্থ লইয়া মারামারি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেও হিট্‌লার চেষ্টা করেন এশিয়া ও আফ্রিকায় য়ুরোপের তাঁবেদারী ও ভোগদখল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির কিঞ্চিৎ অদল বদলে বৃটেনের সহিত রফা করিয়া লইতে। তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া হিট্‌লার ইংরেজের সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন এবং আফ্রিকা ও বল্কানের পথে সুয়েজের দিকে ধাবিত হন আর রাশিয়ার ভিতর দিয়া ভারত সীমান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করেন। হিট্‌লার ও চার্চিলের জাতীয়তাবাদের ব্যভিচারের মধ্যে নীতিতে পরস্পরে ষোল আনা মিল। গরমিল কেবল নিজ নিজ প্রাধান্য লিপ্সায়।

সাম্রাজ্যবাদীর এই হানাহানি গত দুইশত বৎসর জাতীয়তার লড়াই বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। জার্মাণী ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক স্বার্থে বিরোধ বা ফরাসী ও বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থে বিরোধ ফলাও করা হইয়াছে জার্মাণ ও ফরাসী জাতির বিরোধ বা বৃটিশ ও ফরাসী জাতির বিরোধ বলিয়া। কিন্তু ফরাসী বাণিজ্যিক স্বার্থ ফরাসী জাতীয়তা কিনা এ প্রশ্ন তুলিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই বা তুলিলেও জবাব পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ ধনতন্ত্র ইতিমধ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত রাষ্ট্র-যন্ত্র অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং নিজেদের ধনিক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে অগণিত

জনসাধারণকে বলি দিবার সকল আয়োজন সমাপ্ত করিয়াছে। জনসাধারণকে আত্মচেতনালাভে বঞ্চিত রাখার উপর নির্ভর করে ইহার বনিয়াদ। সাম্রাজ্য-শোষকের জাতীয়তাবাদ স্বদেশেও তমোগুণের পরিপোষক।

জার্মাণীর শ্রেষ্ঠজাতি বা হেরেনফোক্ (Herrenvolk) তত্ত্ব ও মাথা গুঁজিবার স্থান বা লেবেন্স্‌রউম (Lebensraum), বৃটেনের প্যাক্স্ ব্রিটানিকা (Pax Britannica) ও নানাজাতির যৌথ পরিবার (Commonwealth of Nations) এবং জাপানের এশিয়াবাসী বুলি (Asia for Asiatics) ও পারস্পরিক সমৃদ্ধির এলাকার (Co-prosperity Sphere) আওয়াজ আসলে একই শোষণতন্ত্রের বিভিন্ন পরিচয়। ইহার মধ্যে মানব জাতির জন্য প্রীতি নাই বা স্বদেশ-বাৎসল্যও নাই। আছে কেবল উন্মত্ত লিপ্সা ও বিদ্বেষের কুটিল ও সূক্ষ্ম অভিযান। শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া যাহাদের ক্ষেপান হয় তাহাদিগকে বিভ্রান্ত রাখা হয় দেশ ও জাতির নামে 'মাথা গুঁজিবার স্থান' দখলের আওয়াজ দিয়া। উহা লাভের উপায় 'অবনত' আর একদল মানব সমাজকে বশীভূত ও হত্যা করা। কিন্তু কাহার জন্য এই স্থান?—কতকগুলি স্থিতস্বার্থ ধনিক ও ভূস্বামীর শোষণের জন্য! ইহাই Pax Britannica (প্যাক্স ব্রিটানিকা) নীতি। 'কমন্‌ওয়েলথ্ অব নেশন্‌স্' ও 'কো-প্রস্‌পারিটি স্ফিয়ার' কথার মারপ্যাচে শোষণের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীর বিনয় প্রকাশের চেষ্টা মাত্র। অধিকৃত দেশে জাতীয় জাগরণ ও প্রতিরোধ-আন্দোলন নিরোধের উদ্দেশ্যে এই কুটিল অভিনয়। 'কমন্ ওয়েলথ্' ও 'কো-প্রস্‌পারিটি' কাহার? শোষকের দেশীয় ও মানুষের-অগ্রগতির-পরিপন্থী কতিপয় স্থিতস্বার্থ মালিকের। স্বদেশে ও শাসিত দেশে মানব-মনের বিকাশে বাধা-বিভ্রান্তিকর নিষ্ক্রিয় তামসিকতার অপূর্ব

আধিপত্য এই সব বিকৃত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার ভাঁওতায়।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণী ও তুরস্কের অধীনস্থ দেশগুলি বিজয়ীদল ভাগ করিয়া লয়, নানান বুলির অন্তরালে ঐ সকল দেশের বন্ধন দৃঢ় করিয়া শোষণক্ষেত্রের বেড়াজাল শক্ত করিবার জন্য। সকল শোষকের মধ্যে দেখা যায় সেক্ষেত্রে অপূর্ব মিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও জাপান, জার্মাণী ও ইতালীর অধিকৃত দেশগুলি বিজয়িগণ ভাগাভাগিতে স্ব স্ব শোষণক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিবার আয়োজন করিয়াছে পাকাপাকি ভাবে এবং যাবতীয় জাতীয় আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হইয়াছে পরস্পরে সমান সহযোগিতায়। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনাম্‌-এ ইহার নগ্নরূপ প্রকাশ।

(৩)

বিকৃত জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় পরাধীন দেশে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় তাহা বলিষ্ঠ ও সজীব। এই জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পত্তন। এই জাতীয়তাবাদ তাই বিচ্ছেদমূলক। শোষকের দেশের ধনিকের শোষণনীতির ফলে শাসন পরিচালনায় অধিকার-বঞ্চিত জনগণের পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের দাবীতে এই জাতীয়তার রূপ। এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা নির্দেশে বিভিন্ন নীতির আশ্রয় বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী গ্রহণ করিয়াছে। উহা কখনও আশ্রয় লইয়াছে এক ভাষার উপর, কখনও এক বর্ণ বা বংশ পরিচয়ের উপর কখনও এক ধর্মের উপর, কখনও এক ঐতিহাসিক ঐক্যের উপর, কখনও এক অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর, আবার কখনও বা এক ভৌগোলিক সংস্থানের উপর।

এই কারণে জাতীয়তাবাদের বা জাতির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। ভাষার আবেদন সর্বাগ্রে। ভাব প্রকাশের অবলম্বন ভাষা। ভাষার ভিত্তিতে সাহিত্য মানুষের একাত্মতা সৃষ্টি করে এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করে। সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐক্যে ভাষার প্রভাব যত প্রবল অন্য কোন নীতির প্রভাব তত নয়, এবং পৃথিবীতে ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা যত হইয়াছে অন্য কোন আশ্রয়ে তত হয় নাই। তথাপি রাষ্ট্র স্থাপন ও জাতীয়তা পত্তনের জন্য ভাষার ঐক্যই অপরিহার্য নয়। যেমন সুইট্জারল্যাণ্ড। এখানে তিনটি পৃথক সবল সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের এক অপূর্ব সমন্বয়ের উপর সুইস্ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত। এক প্রাচীন ঐতিহ্য এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অক্ষত রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। অথবা অলস্ পর্বতমালার তুষারধবল সমুচ্চ শৃঙ্গরাজীর ঊর্ধ্বে বিরাট বিশ্বে আকর্ষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতীন্দ্রিয় আবেদন এই রাষ্ট্রের ঐক্য অব্যাহত রাখিয়াছে। সুইস্ জাতীয়তাবাদের আশ্রয় ভাষা নহে, বরং এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থান ও ঐতিহাসিক ধারা যাহার কোন নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা হয় না। চীনের জাতীয়তার আশ্রয় ভাষা নহে—সাহিত্য ও ঐতিহ্য। উত্তর চীনের ভাষা ও দক্ষিণ চীনের ভাষা এক নহে, কিন্তু লিখিত সাহিত্য উভয়ের এক, এবং এই লিখিত সাহিত্যের ঐক্যেই চীন-জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মাঞ্চুকুয়োর জাতীয়তাবাদ এক বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক দূরত্ব এবং দুইটি প্রবল রাষ্ট্রের প্রতিবেশে ও আক্রমণে চীন হইতে স্বতন্ত্রধারায় প্রবাহিত। ইন্দোনেশিয়া, মালয় উপদ্বীপ, ভিয়েৎ-নাম এবং ভারত-বর্ষে জাতীয় আন্দোলনে ভাষার ভিত্তি ক্ষীণবল এবং ভাষার দাবী এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

ধর্মের ভিত্তিতে জাতীযতাবাদ বাস্তবে রূপ নেয় নাই। মধ্যযুগে ধর্মের নামে রক্তপাত হইযাছে প্রচুব, এবং সাম্রাজ্যও স্থাপন হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'খৃষ্টীয় ধর্মবাজ্যে' ইহুদীকে প্রজার অধিকাব হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। ইহুদী-নির্যাতনের কাবণ ধর্ম অপেক্ষা বর্ণ-বিদ্বেষ ও ইহুদীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে অসহিষ্ণুতাই ছিল বেশী। আবের সাম্রাজ্যে খৃষ্টান ও অ-খৃষ্টান উভযবিধ প্রজাই ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্য য়ুবোপে খৃষ্টান ধর্মেব কোন ক্ষতি কবিতে পারে নাই। আবাব ধর্ম রাজ্যে বিশেষ প্রভুত্ব লাভ করিলেও প্রজার আচরিত ধর্ম বিলুপ্ত হয নাই বা সেরূপ কোন উন্মত্ত প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে নাই। মহাবাজ অশোক ও বিম্বিসব বৈদিক হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। আবার অজাতশত্রুর হাতেও বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয নাই। আওরঙ্গজেবেব প্রজাব-ধর্মে-অসহিষ্ণুতা মোগল সাম্রাজ্যের পতন নিকটবর্তী কবিযাছিল মাত্র। আজ তাই পৃথিবীতে ধর্মের উপব কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নয়। দিকে দিকে ধর্মবিশ্বাসকে মানুষের পারিবারিক বা এমন কি ব্যক্তিগত ব্যপারে পবিণত করিবার প্রবণতা। ভাবতবর্ষে আজ ধর্মের উপর রাষ্ট্র স্থাপনেব দিবাস্বপ্নও দেখা যাইতেছে, কিন্তু উহা জাতীয়তার বন্ধনসূত্রেব হদিশ পায় নাই। খৃষ্টান ধর্ম যদি জাতীয়তা সৃষ্টি করিত তবে য়ুরোপে এতগুলি যুদ্ধবিগ্রহ সম্ভব হইত না।

বর্ণ বা গোষ্ঠীবাদেব উপর জাতীয়তা স্থাপনের সফলতাও বড় একটা দেখা যায় না। মানবজাতির ক্রমবিকাশের পথে প্রাকৃতিক বিবর্তনে আজ গোটা দুনিযার সর্বত্র বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বাসা বাঁধিয়াছে। ইহার মধ্যে যুগের আবর্তনের সাথে এমন রক্তসংমিশ্রন ঘটিয়াছে যে নৃতত্ত্বে সাচ্চা জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ, এবং অনুরূপ অভিমান নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত ও হাস্যকর। বাঙালী হিন্দুকেও মাঝে মাঝে

আর্যবংশের উত্তরপুরুষের গৌরব করিতে দেখা যায়, অথচ পাস্ত জাতের সেই দাবী নাই! গোষ্ঠীবাদের ভিত্তিতে জাতীয়তার দাবী কল্পনাবিলাস, অবাস্তব এবং অবিজ্ঞানোচিত। ইহাতে সন্দেহমূলক বৈষম্যের ও আভিজাত্যের জন্য মানুষে মানুষে বিদ্বেষ প্রচার হইতে পারে, আর সংখ্যালঘু কোন সম্প্রদায়কে বাস্তুছাড়া করিবার চেষ্টা হইতে পারে। ইতিহাসের নগ্ন বর্বরতার দুষ্ট অভিযান ইহুদী-বিদ্বেষ ও ইহুদী উৎপীড়নের মধ্যে এই গোষ্ঠীবাদের মূঢ় তাণ্ডব দেখা গিয়াছে নাৎসী জার্মাণীতে। পৃথিবীতে তাহাতে কল্যাণ আসে নাই এবং জার্মাণ জাতিরও কোন উপকার হয় নাই। বর্ণবৈষম্যের বীভৎস মহামারীরূপ প্রকট হইয়াছে মার্কিন দেশে। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া এই ব্যাধি মার্কিন জাতির বসন্তের সজীবতা বিনাশ করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শেতাঙ্গগণ যে বর্ণবিদ্বেষের বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে তাহার দাবানলের স্ফুলিঙ্গ অচিরেই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতজাতিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ও এক অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয়ের আশ্রয়ে জাতিগঠন প্রচেষ্টা চীনদেশ ও ভারতবর্ষে সুরু দেখা যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদে অর্থনৈতিক স্বার্থ সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে নাই। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও জার্মাণী অষ্ট্রিয়াকে অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'কুপ্‌ল্যাণ্ড্ প্ল্যান্' অর্থনৈতিক ভিত্তির দাবী করে। কিন্তু কুপ্‌ল্যাণ্ড্ প্রস্তাবের স্বপক্ষে কোন দিকেই কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। অর্থনৈতিক দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই ভারতে পাকিস্থান রাষ্ট্র পত্তনের আয়োজন হইয়াছে।

ভৌগোলিক অবস্থান রাষ্ট্রস্থাপনে বিশেষ শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে এবং রাষ্ট্রিক জাতীয়তার বিশেষ নিয়ন্তাও বলা চলে। হিমালয়ের

উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গরাজী ভারতের সমতলভূমিকে বোধ হয় চিরকালের জন্য উত্তরের মালভূমি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—রাষ্ট্র হিসাবে ও জাতীয় ঐক্যবোধের ব্যাপারে। আল্পস্ পর্বতের অধিত্যকা ও চতুর্দিকে তিনচারটি বলিষ্ঠ ও সচেতন জাতির অবস্থান সুইস্ জাতীয়তা রক্ষা করিতেছে। বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্যই মালয় উপদ্বীপের জাতীয়তাবাদ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। আবার সেই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানেই প্রবল হুঙ্কারমুখর পাকিস্থানের সৌধ পূর্বভারত হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে এবং এক সজীব বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ নূতনরূপে জাগ্রত হইতেছে। ইহাতে অবশ্য ভাষা-সাহিত্য, গোষ্ঠীপরিচয় ও ঐতিহাসিক ভাবধারার আবেদন আছে। কিন্তু এ সবের মূলেও আছে বাংলার বিশেষ জল-হাওয়ায় গড়া কোমল মনোবৃত্তি বা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থিতির বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ শত্রুর বিরোধিতার উপরও জাতীয়তার রাখীবন্ধনের চেষ্টা বিরল নয়। আরব লীগের মধ্য দিয়া আজ একটা বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদ পত্তন হইতেছে যাহা আরব মরুভূমির চৌহদ্দি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার মূলরস আসিতেছে য়ুরো-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা হইতে। সোভিয়েট জাতীয়তার গ্রন্থি নিশ্চিত ও দৃঢ় হয় বৈদেশিক আক্রমণের মুখে। ইংরেজ-বিরোধিতায় প্রবল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব; এবং অপর সকল সমন্বয় শক্তির অভাব থাকায় ইংরেজকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবার উদ্যমের মুখেই এই উদ্ধত জাতীয়তাবাদ ধূলিসাৎ করিবার জন্য ভারতের যাবতীয় অন্তর্নিহিত বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে।

কোন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট নীতিতে জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ কোন দেশেই গড়া সম্ভব হয় নাই। অতএব জাতীয়তাবাদের কোন

সংজ্ঞা নাই। অথচ ইহার অস্তিত্ব প্রাণের অবস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ শক্তির মতো সত্য যাহার কোন রূপ দেওয়া যায় না—কোন বাঁধাধরা পথের বন্ধনে যাহাকে বাঁধা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে সমন্বয়ের পথে বশীভূত করা যেখানে যতটা সম্ভব হইয়াছে সেখানে সেইভাবের জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ভাব-সমন্বয়ের যেদিকে যে পরিমাণ শিথিলতা আসে জাতীয়তায় সেদিকে সেই পরিমাণে ভাঙ্গন ধরে। বিরোধেই জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এবং বিরোধেই উহার নবরূপ গ্রহণ। জাতীয়তার ভিত্তি কেবল এই বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয়ের উপর অবস্থিত।

এই কারণে দৃশ্যত বিচ্ছেদমূলক হইলেও জাতীয়তাবাদ প্রেমধর্মী। স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে ইহা মানুষকে ভালবাসিতে চায় আর তাহার দুঃখ ব্যথা অপমান দূর করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। প্রেমধর্মী জাতীয়তাবাদ তাই দুঃখ বরণ করিতে পিছু-পা হয় না। এই জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম করে, কিন্তু তাহাতে কোন বিদ্বেষ নাই, হিংসা নাই। স্বাতন্ত্র্য দিয়াই ইহা বিশ্বে মৈত্রী স্থাপন করিতে চায় যাহা সাম্রাজ্যবাদ "কমনওয়েলথ্ অব নেশনস্" বা "কো-প্রস্পারিটি স্ফিয়ার" ইত্যাদি হাজার বুজরুকি দিয়াও স্থাপন করিতে পারে না। বাহ্যত খণ্ডনমূলক হইলেও কার্যত এই জাতীয়তাবাদই পৃথিবীকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে সমর্থ। কারণ জাতি সংগঠনের জন্য ইহার আবেদন সর্বমানবের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। মুক্তি যত বাস্তবিক হয় আত্মীয়তা হয় তত দৃঢ়। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বোধ করি আধুনিক সোভিয়েট দেশে মেলে।

সংজ্ঞা যাহাই হোক, জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া মানুষের সত্যিকারের ঐক্য সম্পাদন করিবার দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং ইহার মূল কথা প্রীতি, দরদ ও ভূয়োদর্শন। এই জাতীয়তাবাদের

প্রকৃত স্বরূপ নিগৃহীত মানুষের উদ্ধার ও আত্মস্থ করিবার প্রেরণায়। সে প্রেবণায় আসে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মূলে জাতীয়তাবাদীর অন্তরে কোন বিদ্বেষ থাকিতে পারে না; এবং এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই পৃথিবীময় মানবজাতির বিবর্তন ও সভ্যতাব ক্রমবিকাশ হইয়াছে। নীহারিকা সৃষ্টির কাল হইতে জীব সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশ পর্যন্ত বিবর্তনের যে ধাবা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীকৃত হইযাছে তাহাতে সৃষ্টিব লীলা এক অতীব গূঢ় রহস্যে আবৃত দেখা যায। কেহ জানে না এই বিবর্তনেব চবম পবিণতি, এবং সেই কাবণে পৃথিবীব জন্য, জীবেব জন্য বা মানুষেব জন্য কোন শাশ্বত সত্য কেহ নির্ণয় কবিতে পাবে নাই। যে দর্শনকে বলা হইযাছে সাংখ্য ও কৃতান্ত, বিবর্তনের ধাবায তাহাও পবিত্যজ্য হইযা পডিয়াছে। কিন্তু এই পবিত্যাগের প্রাক্কালে বাধিযাছে নবীনে ও প্রাচীনে অনিবার্য সংঘাত। প্রাচীনেব কৃতান্তকে নবীন অভিহিত কবিযাছে সযতানি, বুজরুকি, শোষণতন্ত্র ইত্যাদি বলিযা। আবাব নবীনেব চিন্তাধাবাকে প্রাচীন সক্রোধে আখ্যা দিযাছে সংস্কৃতিব ধ্বংসকাবী, সভ্যতার অগাছা ইত্যাদি বলিযা। আজ তাই সাম্রাজ্যবাদী অতি আন্তবিকতাব সহিতই বিশ্বাস কবে যে সাম্যবাদ ও অধিকৃত দেশেব জাতীযতাবাদ সভ্যতার হানিকব—সংস্কৃতিব শত্রু। কাবণ তাহাব দৃষ্টি দিগন্তে প্রসাবিত নয—তাহাব ভূযোদর্শন আপনাব চিরাচরিত বাধাধবা সঙ্কীর্ণ আবর্তে সঙ্কুচিত। সে তো জানে না যে মহাকাশও প্রাণেব প্রাচুর্যে বিস্তাব-ধর্মী। শীতের তুহিনাবৃত পল্লবহীন মৃত্যুমুখযাত্রী শমীবৃক্ষ যদি বসন্তের প্রাণধর্মী সজীব পল্লবেব বার্তাবাহী লতাগুল্মেব স্পর্ধিত আবির্ভাবে রুষ্ট হয তবে তাহার দোব কি? সে জানে, সে তাহার সহস্রমূল ভূতলে বিস্তার করিয়া ধবণীব সব রস নিংড়াইয়া লইবার সকল আয়োজন পূর্ণ করিয়াও যদি সাহস না পায় পল্লব বিস্তারের

তবে আর ক্ষীণপ্রাণ তৃণগুল্মের মূলধনহীন নিঃস্ব স্পর্ধা কিরূপে সহনীয়? সে তো জানে না, সম্মুখে আছে বসন্তের আনন্দোচ্ছ্বাস, আবার তারপর শ্যামল বর্ষার স্নেহধারা।

এই অনিবার্য বিরোধেই সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রামে প্রাচীন ক্ষীণজীবী-সঙ্কীর্ণতা সংহার করিয়া নবীন ছুটিয়াছে ভূমার সন্ধানে। কোন যুগে কোন ধর্ম, কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব পৃথিবীর সর্বমানুষের উন্নতির জন্য এমন কোন বলিষ্ঠ আত্মিক শক্তি প্রকট করিতে পারে নাই যাহা আজের জাতীয়তাবাদের চাইতে বেশী কার্যকরী।

প্রেমধর্মী জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্মদর্শনে পার্থক্য এই যে, জাতীয়তাবাদ বস্তুতান্ত্রিক আর ধর্মদর্শন প্রাণধর্মী; জাতীয়তাবাদ সমষ্টির উন্নতিকামী আর ধর্ম ব্যষ্টির আচরণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়াসী। কিন্তু ব্যষ্টির আচরণ নির্ণয় হইয়াছে সমষ্টির পটভূমিকায়। সমষ্টি ও সমাজের অস্তিত্বে সজাগ থাকিয়া তবেই এই আত্মার ধর্ম বিধিবদ্ধ হইতে পারে। এই হিসাবে জাতীয়তাবাদ আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য সহায়ক। জাতীয়তাবাদ মুখ্যত একটা রাষ্ট্রিক আন্দোলন, আর আধ্যাত্মিকতা 'অ-রাষ্ট্রিক'। হার্ডারের জাতীয়তা 'অ-রাষ্ট্রিক'। কিন্তু উহা কোন ধর্ম-আন্দোলন নয়; আর এই 'অ-রাষ্ট্রিক' ফোক্ (volk) তত্ত্বের অনিবার্য পরিণতি জার্মাণ রাষ্ট্র গঠনে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ। "হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।" রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ-সঞ্জীবনী দর্শন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কোন বাস্তব রূপ নিতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্র, মাতৃভূমি ও দেশবাসী—ইহাই লইয়া প্রকৃত জাতীয়তাবাদের স্বরূপ। 'সুজলা

সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা' মাতৃভূমি আর তাহার সপ্তকোটি কণ্ঠের নিনাদ ও দ্বি-সপ্তকোটি হাতের অস্ত্র—ইহাতেই জাতীয়তাবাদের আসল প্রতিষ্ঠা। এই জন্য বঙ্কিমই বিশ্বের প্রগতিমূলক বাস্তব জাতীয়তাবাদের অগ্রগামী ঋষি।

(৪)

সাম্রাজ্যবাদী স্থিতস্বার্থের সহিত সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের এক বিরাট অধ্যায়। সর্বহারার সংগ্রাম আজ দেশে দেশে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদে প্রাণদান করিয়াছে এবং প্রেমধর্মী জাতীয়তাবাদকে নবরসে সঞ্জীবিত করিয়াছে। সর্বহারার সংগ্রাম সুরু হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। এই আন্তর্জাতিকতা সর্বমানবের জন্য পরিব্যাপ্ত এক শাশ্বত নীতির সন্ধান মাত্র। জাতীয়তার সহিত ইহার বিরোধ নাই। ইহাতে ব্যক্তির সত্তা বিকাশে কোন বাধা নাই। দিকে দিকে নিগৃহীত ছোটলোকের মুক্তির বাণী এই আন্তর্জাতিকতায়। ইহা মহিমান্বিত জাতীয়তাবাদ।

শিল্পবিপ্লব, ধনতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্য শোষণ এককালীন ঘটনা। আধুনিক শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, ফলিত বিজ্ঞান-বলে প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে মানুষের শ্রমের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই বর্ধিত উৎপন্ন সম্পদে মানুষ তাহার জীবন-সংগ্রামে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে এবং 'শরীর-যাত্রায়' অভাবের হাত হইতে খানিকটা নিষ্কৃতি পাইবে।

আধুনিক যান্ত্রিক শিল্প কারখানায় উৎপাদনের মূল (১) বিজ্ঞান, (২) শ্রম এবং (৩) মূলধন অর্থাৎ জাতির পূর্বতন শ্রমলব্ধ সঞ্চিত সম্পদ। মানুষের শ্রম বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রয়োগে প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাতির সমৃদ্ধি বাড়ানর সুযোগ থাকায়

নবীন শিল্পবিপ্লব সমাজকল্যাণকর ; এবং এই কারণেই এই শিল্পপদ্ধতি সমাজের নৈতিক অনুমোদন লাভের যোগ্য। কিন্তু শ্রম, মূলধন ও বিজ্ঞান—ইহাদের কেহই এই শিল্পযন্ত্র স্বকীয় স্বার্থে পরিচালনা করিবার ন্যায়ত অধিকারী নহে। ধনিকের মালিকানা ও বিজ্ঞানীর আধিপত্য তাই অবৈধ। এই বিপ্লবের পরিণতিতে শ্রমিক বলিতে গোটা সমাজকে বুঝায়। কাজেই সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত শিল্পের উপর সমষ্টিগতভাবে সকল শ্রমিকের কর্তৃত্ব সামাজিক কর্তৃত্বের সামিল। সেইজন্য শিল্প ব্যবস্থার উপর শ্রমিকের কর্তৃত্বে পরিণামে সমাজের কর্তৃত্বই সূচনা করে। পক্ষান্তরে ধনিকের মালিকানা কতিপয় মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘুর কর্তৃত্ব যাহার ফলে সমাজের শ্রমলব্ধ সম্পদ তাহাদের বিলাসের রসদ যোগায়। মূলধনের মালিকানা তাই অবৈধ।

ফলিত বিজ্ঞানের নিত্য নূতন তথ্য যান্ত্রিক কৌশলে শিল্পে প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ হওয়ায় মানবসভ্যতায় এক যুগান্তর বা বিপ্লব ঘটিয়াছে। শিল্পবিপ্লব একদিকে শিল্পপদ্ধতির বিপ্লব, অন্যদিকে ইহা সমাজের কাঠামো বদলাইয়া সভ্যতার বিবর্তনে এক নূতন সামাজিক বিপ্লব আনিয়াছে। এই কারণে প্রয়োগ-বিজ্ঞানও বিজ্ঞানীর স্বেচ্ছাচারের বা স্বার্থে নিয়োগের হাতিয়ার হইতে পারে না। উহা মানবজাতির বিবর্তনের পথে উন্নতির আর একধাপ সোপান অতিক্রম মাত্র।

আধুনিক শিল্পবিপ্লব এই সঙ্গত ও সহজ ধারা অনুসরণ করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের সাধনা ধনিক অর্থবলে কুক্ষিগত করিয়া স্বশ্রেণীর মালিকানায় পরিণত করিয়াছে এবং মূলধনকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভুক্ত করিয়া গোটা শিল্পজগতের মালিকানা দখল করিয়া বসিয়াছে।

শিল্পের মালিকানা দখলের ফলে সম্পদের প্রধান ও প্রকৃত উৎপাদক মজুর হইয়া পড়ে ধনিকের অধীনস্থ; এবং ধনিক কর্তৃক এইভাবে সমাজের ভারসাম্য বিলোপ করার সাথে স্থরু হয় সংঘাত। ইহাই শ্রেণী সংগ্রামের মূল কথা।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগে নবীন শিল্পবিপ্লব প্রতিযোগিতায় কুটীর শিল্পকে হটাইয়া দেয় অতি সহজেই। ফলে কুটীরশিল্পী তাহার পুরাতন বৃত্তি ছাড়িয়া নূতন কারখানাশিল্পে মজুবী লইতে বাধ্য হয়। এইভাবে একদিকে চলতি সমাজ ব্যবস্থার বিপর্যয়ে নূতন ধরণের সামাজিক বিধান পত্তনের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে মূলধনের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় সমস্ত শিল্পেব মালিকানা আসে পুঁজিপতির হাতে। কুটীরশিল্পের বিপর্যযে সমাজেব বৃত্তি-জীবীকে পাঠান হয় কারখানায় মজুবী লইবার জন্য। আব কারখানা ধনিকেব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হওযায় সমাজের জন-সাধারণের ভাগ্য সেই কতিপয় মুষ্টিমেয় ধনিকের নিযন্ত্রণাধীনে আসিয়া পড়ে। বাজারের দর-দস্তুরীতে সেখানে শ্রম ক্রয়-বিক্রয় হয়—অত মজুরীতে পোষায় চাকরী কর, না হয় চলিয়া যাও, এই নীতি স্বাভাবিক বিবেচিত হয়। বাজারে দর কষাকষির তথাকথিত "চাহিদা-ও-জোগানের" এক শোষণ নীতি শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন মজুর এইভাবে সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক লইতে বাধ্য হইয়া জীবন-সংগ্রামের কঠোর সাধনায় রত হয়, আর তাহার এই অসহায়.অবস্থার সুযোগে ধনিক নিজের মুনাফার অঙ্ক পরিস্ফীত করিতে থাকে। আবার রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া সে এই নীতিহীন শোষণতন্ত্র আইনসঙ্গত বলিয়া জাহির করিয়া চলে।

শ্রমিককে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত কবিয়া ধনিক যে অতিরিক্ত অংশ মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করে উহাই কার্ল মার্ক্‌স্ বর্ণিত

"উদ্বৃত্ত সম্পদ" (surplus value). ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভুক্ত করিয়া ধনিকের মালিকানা-স্বত্বে এই উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগ স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

এই ব্যবস্থার প্রধান গলদ, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণক্ষেত্রে ইহা মানুষের উপরে তাহারই শ্রমে সৃষ্ট মূলধনকে প্রাধান্য দেয়। ইহা মজুরকে নিযুক্ত করিয়াছে মূলধনের সেবায়—চৈতন্যকে করিয়াছে জড়ের দাস—এবং এই সূত্রে কতিপয় মুষ্টিমেয় সামাজিক পরগাছা পরভৃত ধনিককে অধিকার দিয়াছে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার, তথা শ্রমিকের উপর খপরদারী করিতে। মানুষের সাম্যকে অস্বীকার করিয়া ইহা বিভেদের জয়গান গাহিয়াছে এবং হিংসা ও বিরোধের বিষ ছড়াইয়াছে।

নীতিধর্ম বিরোধী সাম্যহীন দুষ্ট এইরূপ শোষণ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি সংঘাত। ইহাই শ্রেণীসংগ্রাম। আত্মা কখনও দাসত্ব স্বীকার করিয়া লয় না। মূলধনের অধীনতা পাশ ছিঁড়িবার জন্য শ্রমিক তাই সংঘবদ্ধ হইয়া আহ্বান করে সংগ্রামের। ইহাই শ্রেণী-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম তাহার স্বাধীনতার সংগ্রাম—তাহার স্বাধীকারের সংগ্রাম। তাহার দাবী, উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্তা হইবে মানুষ—মূলধন নহে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই পুণ্যবাণীর উদাত্ত ঘোষণা এই সংগ্রামে।

এই ঘোষণা সুবিধাভোগীর মালিকানা-স্বত্বের মূলে আঘাত হানিয়া স্থিতস্বার্থের হৃৎকম্প আনিয়াছে এবং যাবতীয় সাম্রাজ্য-শোষণতন্ত্রের রুদ্র প্রতিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সর্বহারার এই শ্রেণী-সংগ্রাম তাই পরাধীন দেশের জাতীয়তাবাদের পরম সুহৃদ।

কিন্তু গোড়াতে এই সংগ্রাম জাতীয়তার ভিত্তিতে সুরু হয় নাই। বরং ইহা জাতীয়তাবাদের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিকৃত জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্য বিস্তারের জয়গান গাহিয়া ধনিকের প্রচার যন্ত্রে পরিণত হয় এবং অগণিত নিষ্কলুষ জনসমাজকে শোষকের স্বার্থদ্বন্দ্বে বলি দেয়। শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রাম ধনিকের এই কূটখেলা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সর্বজাতির সর্বহারার সংঘবদ্ধ আন্দোলন সুরু করে ও 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই ধ্বনির মধ্য দিয়া জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রথম দিকে এই জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতার বিতর্কে সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রমিক নেতৃত্বের দৃষ্টিও আচ্ছন্ন ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় "ইণ্টার নেশনাল্"-এ (১৮৬২-৭৩ ও ১৮৮৯)। আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদে কোনরূপ সমন্বয় প্রচেষ্টাই হয় নাই; বরং সর্বপ্রকারে জাতীয়তাবাদ বিরোধ সেইযুগে মার্ক্সিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, সিণ্ডিকেলিষ্ট্ প্রভৃতি শ্রেণী-সংগ্রামশীল দলের রেওয়াজ ছিল। জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতান্ত্রিক শোষণতন্ত্রের সামিল, আর শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রাম আন্তর্জাতিক—"মজদুরের কোন পিতৃভূমি নাই", ইহাই ছিল 'দ্বিতীয় ইণ্টারনেশনাল' যুগের মন্ত্র। এইজন্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সিণ্ডিকেলিষ্ট্ নেতা জাঁ জোরে-কে (Jean Jeaurs) হত্যা করিয়া তবে ফরাসী সরকার জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়।

প্রথম প্রথম এই জাতীয়তা-বিমুখ শ্রমিক আন্দোলন এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও জাতীয়-স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী জাতীয়তা-বাদী শক্তির প্রতিও বিরূপ ভাব পোষণ করে এবং উপনিবেশ সমূহের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করে না।

এই ভ্রান্ত নীতির মূলে ছিল মার্ক্সীয় 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা। শ্রমিকের উৎপন্ন সম্পদ হইতে শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ ফাঁকি দিয়া ধনিক আত্মসাৎ করে। ইহাই ধনিকের 'উদ্বৃত্ত সম্পদ'। কিন্তু বণ্টনে এই ফাঁকিবাজী উৎপন্ন সম্পদ লইয়া সরাসরি ভাবে হয় না। মুদ্রার বিনিময়ে সেগুলি বাজারে বিক্রয় হয় এবং এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টনে মজুরকে ফাঁকি দিয়া উদ্বৃত্ত অংশ ধনিক গ্রহণ করে। কিন্তু বিক্রয়ের পূর্বেই মজদুরের প্রাপ্য নির্ধারণ হইয়া থাকে। পরে ক্রেতার নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারার 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' সংগ্রহ সম্ভব হয়। আবার বাজারে বিক্রয় না হইলে উৎপাদিত পণ্যের সর্বাংশ মজুরকে দিলেও তাহার চলে না। দরের চড়তি-পড়তির উপর মুনাফার কম-বেশী নির্ভর করায় প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক 'উদ্বৃত্ত সম্পদের' পরিমাণ নিরূপণ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয় না।

'উদ্বৃত্ত সম্পদ' তাই উৎপাদন ও মুদ্রার সাহায্যে বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থায় তিনটি অংশ প্রধানত ক্রিয়মান— ধনিক, শ্রমিক ও ক্রেতা। শ্রমিকের মজুরী বিক্রয়ের পূর্বেই নির্দিষ্ট হওয়ায় ক্রেতার নিকট ন্যায্য মূল্যের অধিক আদায় করিতে না পারিলে 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' সংগ্রহ সম্ভব হয় না। বাণিজ্যের বাজার যদি উৎপাদন-শিল্পের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে কালক্রমে দেশের সমগ্র জনসাধারণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়ায় ক্রেতা আর শ্রমিক অভিন্ন হইয়া পড়ে। তখন শ্রমিককে কম মজুরী দিয়া অধিক মূল্যে শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় আর সম্ভব হয় না। ফলে উদ্বৃত্ত মুনাফা সংগ্রহ আপনা হইতেই অসম্ভব হইয়া যায়। এই 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' সংগ্রহ ততদিনই সম্ভব হয় যতদিন ক্রেতা ও শ্রমিকে পার্থক্য থাকে—অর্থাৎ যতদিন দেশের সকল স্তরের জনসাধারণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সহিত সম্পূর্ণভাবে জড়িত হইয়া না পড়ে।

এই স্তর অতিক্রম করিবামাত্র (এবং অতি অল্পদিনেই উহা অতিক্রম হয়) শ্রমিককে ফাঁকি দিয়া উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করিতে গেলেই উৎপন্ন দ্রব্যের কাটুতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সমগ্র উৎপাদন যন্ত্র তথা অর্থনীতিতেই বিপর্যয় আসিয়া পড়ে।

ধনিকের পক্ষে এই বিপর্যয় এড়ান সম্ভব হয় বৈদেশিক বাজারে অর্থাৎ সাম্রাজ্যের বাজারে বিক্রয়ের ফলে। এখানে ক্রেতা হয় উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশের জনসাধারণ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে স্থানীয় শিল্প পঙ্গু করিয়া শাসকের দেশের শিল্পজাত পণ্য সেখানে বিক্রয় করা চলে অবাধে। আর এই ক্রেতা সাম্রাজ্যবাদীর দেশের অর্থনৈতিক বণ্টন ও বিলিব্যবস্থায় সম্পর্কহীন থাকায় ইহাকে শোষণ করিয়াই 'উদ্বৃত্ত সম্পদ' সংগ্রহ সম্ভব। নিজের দেশের শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির দাবী পূরণ করিয়াও ধনিক সাম্রাজ্যের বাজার শোষণ করিয়া অবাধে তাহার অতিরিক্ত মুনাফা সংগ্রহ করিতে পারে এবং শ্রেণী বিভাগের উপর অর্থনৈতিক কাঠামো খাড়া করিয়া প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। বরং অপর দুর্বল দেশের মজুরের অপেক্ষা অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিককে বিভ্রান্ত করিতে ও তাহারই স্বার্থের অজুহাতে সাম্রাজ্যরক্ষায় উৎসাহিত করিতেও পারে। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের আধিপত্য থাকিতে তাই শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিক জয়যুক্ত হইতে পারে না।

'দ্বিতীয় ইণ্টারনেশনাল' শ্রেণী সংগ্রামের এই মূল্যবান দিক সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। সেইজন্য ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ থাকিয়া উহা জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ভূমিকায় কার্য করে। কিন্তু 'তৃতীয় ইণ্টারনেশনাল'-এ (১৯১৮—৪১) বিশেষত রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পরে সকল সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনায় চিন্তার মোর ঘুরিয়া যায়। একদিকে শ্রমিকের বদলে সংঘবদ্ধ

কিষাণেই মার্ক্সীয় শ্রেণী-বিপ্লব জয়যুক্ত করে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশ সমূহের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শ্রেণী-সংগ্রামে মজদুর পক্ষের বিশেষ মূল্যবান সহযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়। আবার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নত দেশ সমূহে (যেমন জার্মাণী, ইতালী, ফ্রান্স ও জাপানে) ফ্যাসীবাদের জয় হওয়ায় এবং বৃটেনে 'শ্রমিকদলের' নেতৃত্বের উপর্যুপরি ডিগ্‌বাজী ও বিশ্বাসঘাতকতায় আজ ইহা নিশ্চিত প্রমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীময় সাম্রাজ্যবাদের অবসানেই অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যেই শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিক জয়যুক্ত হইতে পারে। এই সাফল্য অর্জন করিবার জন্য পরাধীন কৃষিপ্রধান দেশে জাতীয়তার ভিত্তিতে কিষাণ-মজদুর সংগঠনই মাত্র কার্যকরী। আজ তাই 'তৃতীয় ইণ্টারনেশনাল' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে (১৯৪১), এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লবী শক্তি সমূহ জাতীয় আন্দোলনের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নবশক্তিতে সঞ্জীবিত করিতেছে। সেদিন যেখানে সর্বহারার সংগঠনের ধ্বনি ছিল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও—মজুরের কোন পিতৃভূমি নাই' আজ সেখানে 'পিতৃভূমি ফ্রাণ্ট' (Fatherland Front) আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি সমূহও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতেছে।*

(৫)

বিপ্লবী শক্তিসমূহ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়ায় আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় জাতীয়তাবাদ অধিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ফলে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তাবাদে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সম্ভব হইয়াছে এবং সকল দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি সমূহে

* ডিমিট্রফ—'কম্যুনিষ্ট্‌ পার্টির কর্তব্য'—(ফেব্রুয়ারী—১৯৪৩)।

আদর্শের ঐক্য স্থাপন হওয়ায় পরস্পরে সহযোগিতা লাভ করিতেছে। সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী শিবির সমূহ হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রকার শোষণতন্ত্র বিতারিত করিয়া জাতীয়তাবাদ বিপ্লবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং দুনিয়াময় বিপ্লবী শক্তি সমূহের সহিত একদিল হইযা যাইতেছে। আজ তাই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংগ্রামে সহাযতা করে রেঙ্গুন, করাচী, সিড্‌নী ও আমষ্টার্ডামের জাহাজী শ্রমিক, আর ভিয়েৎনাম্-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে রসদ পাঠায় বাংলার জাতীয়তাবাদী দল। আবার ভারতীয় স্বাধীনতার দাবী জানায় বৃটিশ কম্যুনিষ্ট্ পার্টি এবং ভারতে বৃটিশের কূটনীতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেশ মস্কো রেডিয়োর আলোচনা বিশারদ।

অপর পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আজ আর কোন দেশেই 'স্বাধীনতা', 'স্বরাজ' বা 'শাসক চলিযা যাও' ইত্যাদি ধ্বনিতে কার্যোদ্ধার হইতেছে না। আজ সেই স্বাধীনতার স্বরূপ বা শাসক চলিযা যাইবার পরের অবস্থা স্পষ্ট নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হইযাছে। এই নির্দেশের উপরই জাতীয় নেতৃত্বের প্রগতিশীল চরিত্র ও সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে শাসক তাহার সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব এমন ভাবে বিস্তার করিযাছে যে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে যে শক্তি দরকার সেই শক্তি সংগঠিত করিলেই একটা বিরাট সমাজ-বিপ্লব সাধিত হয়। জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য সর্বত্র শাসকের বর্তমান নীতি হইয়াছে "ধীরে ধীরে 'স্বায়ত্বশাসন' প্রদান" (Gradual Development of self Government) এবং ঐ ভাঁওতায় এক একটি শাসনতন্ত্র দিয়া পরাধীন জাতির মধ্যে রীতিমত ভাবে বিভেদ সৃষ্টি হইযাছে শাসকের আশ্রয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে

যে সকল শ্রেণীর দোহাই পারা হয় তাহাদিগকে স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করিলেই রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। শাসকের ভরসা যে কয়দিন এই বৈপ্লবিক শক্তি সংগঠিত না হয় ততদিনের। আবার এই বৈপ্লবিক জাতীয় শক্তির শ্রেণীগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে অধীনস্থ দেশেও উপরতলার সুবিধাভোগী নেতৃত্ব শঙ্কিত হইয়া জাতীয় আন্দোলনের মোর ঘুরাইয়া লইতে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদীর সহিত আপোষ করিয়া বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পড়ে।

এইভাবে আভ্যন্তরিক সংগ্রাম ও বিবর্তনের ভিতর দিয়া আজ সর্বদেশে জাতীয়তাবাদ অগ্রসর হইতেছে। ইহার অনিবার্য পরিণতি সর্বহারা 'ছোটলোক'-এর অর্থাৎ জনগণের জয়ে এবং ব্যাপক রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবে। আজ যে জনশক্তি লইয়া সংগ্রাম অগ্রসর হইতেছে 'মহাত্মাজীর জয়'এ তাহার কোন অর্থবোধ হয় না। মাউণ্ট্ ব্যাটেনের জায়গায় তামিলনাড়ুর এক জমিদার বা অযোধ্যার এক সূর্যবংশধর যদি দিল্লীর তক্তে বসে, জেনারেল অকিনলেক্‌এর বদলে যদি পঞ্চনদের কোন সিংহ সর্দার ভারতের জঙ্গীলাট হয়, কোন এক নবাবজাদা যদি স্যার জেরেমি রেইজম্যানের স্থলে ভারতের টোডরমল্ হইতে পারে, আর হোয়াইট্‌হলের স্থান দখল করে যদি ওয়ার্ধা বা আনন্দভবন তবেই সব মিটিয়া গেল, এবং সমাজে নানান ভাবে যাহারা নির্যাতিত তাহারা মহানন্দে বগল বাজাইবে এমন সম্ভাবনা নাই।

জাতীয় স্বাধীনতা একটা বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি। ইহাতে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতকগুলি ব্যক্তিমাত্রের পরিবর্তন হয় না। রাষ্ট্রের সমগ্র কাঠামো বদলানই ইহার অন্যতম রূপ। সর্বাপেক্ষা বড় কথা সমাজ বিপ্লব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিলিব্যবস্থাগুলি ঢালিয়া সাজাই আধুনিক জাতীয়তাবাদের মূল কথা। এই জাতীয়তাবাদের রূপ গণসংগঠন এবং ইহার নেতা গণনেতৃত্ব। মহাপুরুষ ও মাননীয়

নেতাদের ঘরোয়া বৈঠকে ইহার নীতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। এই নেতৃত্ব নীতি স্থির করিবে গাছতলায় খোলামাঠে ও প্রতি ঘরে ঘরে এবং এই নীতির কর্মপন্থা সফল করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবে ঘরে ঘরে আবালবৃদ্ধবণিতা। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আজ ইহাই পরিচয় পত্র।

জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ

২। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ।

সাম্রাজ্যবাদীর শোষণের বিরুদ্ধে অধীনস্থ দেশে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ও গৌরবময় ঘটনা। 'শ্রেষ্ঠ জাতি' (herrenvolk) ও 'শ্বেত জাতির বোঝা' (white men's burden) বুলির অন্তর্নিহিত সম্পদশোষণ ও বাণিজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার জাতীয়তাবাদ। এই সংগ্রামের তন্ত্রধারক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গবিপ্লব। বাংলার এই খণ্ডন-নিবোধ আন্দোলনে ছিল একদিকে দাম্ভিক শাসকের অস্ত্রসজ্জা উপেক্ষা করিযা মানবাত্মার নবজীবনে সজীব আত্মপ্রতিষ্ঠা, এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীর বাণিজ্যিক শোষণের বিরুদ্ধে আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টায় স্বদেশী প্রচার।

বঙ্গবিপ্লবের পটভূমিতে আছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের নীল-কর আন্দোলন। নীল-কুঠীয়ালের অত্যাচার দমন এবং সেই সঙ্গে বর্ণ-বৈষম্য দূর করিবার জন্য যাবতীয় সংগ্রামের ভিতর দিয়া বঙ্গবিপ্লবের বনিয়াদ গড়া হয়। এই সংগ্রামের মধ্যেই বাংলার আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়া দেশের সহিত—দেশের জলবায়ু ও জনগণের সহিত যে সংযোগ আসে উহাতেই আসল জাতিপ্রীতি সূচনা হয় এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গাঁথা হয়। এই স্বজাতি-বাৎসল্য প্রেমধর্মী। বিদেশীর অনাচার অত্যাচারে বিক্ষুব্ধহৃদয়ে দেশপ্রেমিক জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করে নাই, বরং আত্মবলির পথে এই অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

জাতীয় সংগ্রামের এই স্বরূপ প্রথমে স্পষ্ট হইয়াছে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে (১৮৫৯)—

"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার,
দেশহিতে যেই **মরে** তুল্য তার নাই হে, তুল্য তার নাই॥"

কবির এই আত্মত্যাগের আহ্বানে আছে বাঙালীর প্রেমসাধনার ধারা। বাংলার জলহাওয়া তাহার কাণে দিয়াছে নিঃস্বার্থ বৈরাগ্যের উদাস সুর; বাঙালী বৈষ্ণব সাধক চৈতন্য শিখাইয়াছে প্রেমের কাছে আত্মবিলোপ; বাঙালী মাতৃসাধক রামপ্রসাদ দেখাইয়াছে সাধনার পথে 'মায়ের চরণতলে' আপনাকে নিশ্চিহ্ন করিবার আদর্শ। দেশ ও দেশবাসীর সেবায় এই আত্মোৎসর্গ হইয়াছে বাঙালীর জাতীয়তাবাদের কষ্টি পাথর। এই পাথরে কষার পরে তবে স্বদেশসেবীকে বাঙালী শ্রদ্ধার আসন দিয়াছে। কোন ভীরু সংগ্রাম-বিমুখ সুবিধাবাদী এই প্রেম সাধনায় স্থান পায় নাই। স্বার্থপর ক্ষমতালোভী দেশপ্রেমিকের আসন লাভ করিতে পারে নাই, কারণ সঙ্কটের দিনে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সুবিধার পথে চলিয়া যায়। তাই নাট্য-সম্রাট গিরীশচন্দ্র দেশসেবীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—('চণ্ড'—১৮৯১)—

"অন্তরের গূঢ়স্থল কর অন্বেষণ মন,
পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোন্ স্বার্থ লুক্কায়িত।—
উচ্চ আশ, উন্নতি প্রয়াস
আছে কি গোপনে ধরি স্বদেশ বৎসলভাব,
আধিপত্য-লিপ্সা কিংবা ভারতের হিত
চালিত অন্তর তব।"

আর সেই সঙ্গে ধ্বনিত হয় বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে সতর্ক বাণী—"Are you sure that you are not excluded by greed of gold, by thirst for money, or love of power?" [তুমি কি নিশ্চিত জান যে, কাঞ্চন-লিপ্সা, অর্থতৃষ্ণা বা প্রভুত্ব-লালসায় তুমি সঙ্কল্পচ্যুত হওনা ?]

এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের আদর্শ বাঙালী জাতীয়-কর্মীর সম্মুখে আজ পর্যন্ত ধরিয়াছেন বাংলার ঋষি ও কবিগণ। বাঙালী দেশসেবীর সাধনা হইয়াছে—

"মা-গো, যায় যেন জীবন চ'লে
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ ব'লে।"+

বাঙালী দেশভক্ত জানিয়াছে—

"প্রকৃত সন্তান জেনো সেইজন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"†

বাংলার বিদ্রোহী কবি ‡ উদাত্ত স্বরে দেশপ্রেমিককে আহ্বান জানাইয়াছেন আত্ম-বলিদানের—

"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান।"

---

* কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

† হরিদাস হালদার।

‡ কাজী নজরুল ইসলাম।

আবার—

"এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা
(মোদের) অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।"

বিদ্রোহী কবির সাথে সুর মিলাইয়া তরুণ কবিও গাহিয়াছেন—

"যারা যুগ যুগ ধরি তুলিয়াছে মায়ের পূজার ডালি,
আপন অস্থি-সমিধে রেখেছে হোমের অনল জ্বালি,
প্রাণ বলি দিতে পূজার অনলে যারা সদা আগুয়ান,
ত্রি-বর্ণ ধ্বজা তাদেরই গরব, শহীদের সম্মান।"*

এই ত্যাগমন্ত্র সাধনা সহজ নহে। প্রতি মুহূর্তে সহস্র ছলনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। প্রতিপদে ব্যর্থতার বিষাদ ছায়া আর স্বার্থপর ভীরুর বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া দৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রসর হওযাব প্রয়োজন আছে। সঙ্কটের দিনে সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে ও অবুঝের অবজ্ঞা সত্ত্বেও হতাশা দূর কবিযা নির্ভযে চলাব মন্ত্র তাই বাঙালী স্বদেশপ্রেমিকেব কানে দিযাছেন কবি—

"যদি গহন পথে চলার কালে
কেউ ফিরে না চায়,
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে॥
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে।"

---

* সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

আবার সেই সুরেই তরুণ কবি গাহিয়াছেন—

"পথ কি অনেক দূর
দুর্গম বন্ধুর ?
আলো নাই থাক, ভয় নাই তবু
প্রাণের প্রদীপ জ্বালাও।"*

এই নিষ্কাম নির্ভিক জাতীয়তাবাদ চাহে দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, জাতির উন্নতিতে অনমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় প্রত্যয় এবং সঙ্কল্পে অবিচলিত নিষ্ঠা। স্বদেশ উদ্ধারে ভক্তির দাবী বাঙালীর জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য। বাংলার জাতীয়তামন্ত্রের অগ্নি-ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশসেবায় উত্থাপন করেন এই ভক্তির দাবী।—

"সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতাব মধ্যে শব্দ হইল—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?'

শব্দ হইয়া সে অরণ্যানী আবার নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল।

......কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল......'আমাব মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?'

এইরূপ তিনবাব সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তব হইল, 'তোমার পণ কি ?'

প্রত্যুত্তবে বলিল, 'পণ আমার জীবন-সর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ ; সকলেই দিতে পারে।'

'আর কি আছে ? আর কি দিব ?'

তখন উত্তর হইল, '**ভক্তি**'।" †

---

* প্রেমেন্দ্র মিত্র।

† 'আনন্দমঠ' (১৮৮১—৮২)—উপক্রমণিকা।

একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা অগাধ সমুদ্র হইতে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে ডাক দিয়াছেন বাঙালীর জাতীয়তার অগ্নি-ঋষি।

"কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা !

"এসো মা, গৃহে এসো, ছয়কোটি সন্তানে একত্রে এককালে দ্বাদশ কোটি করজোড় করিয়া তোমার পূজা করিব।……এই ছয়কোটি মুণ্ড ওই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—ছয়কোটি কণ্ঠে ওই নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয়কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, দ্বাদশকোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।

* * * *

"এস, ভাই সকল ! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা (বঙ্গ প্রতিমা) তুলিয়া ছয়কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।……ভয় কি ? না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"*

অনন্যা ভক্তিতে অবিচলিত থাকিলেই তবে দেশভক্ত সাফল্য-লাভ করিবে। কবি তাই জানাইয়াছেন—

"শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ঘিরে বনের প্রাণী
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না

* * * *

* 'আমার দুর্গোৎসব'—(১৮৭৫)

বন্ধ দুয়ার দেখবি বলে
অমনি কি তুই আসবি চলে ?
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

বাংলার অপর মাতৃ-সাধক কবিরাও এই ধারাতেই বাঙালী দেশকর্মীকে আহ্বান করিয়াছেন মরণ বরণ করিবার জন্য—স্বার্থসাধনের প্রলোভন দেখাইবার জন্য নহে—

"আয় আজি আয় মরিবি কে ?
পশিতে অস্থি শুষিতে রুধির
নিশিথ শ্মশানে পিশাচ অধীর—
থাকিতে তন্ত্র-সাধন মন্ত্র
প্রেত ভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?"*

এইরূপ নিষ্ঠা ও ভক্তির পথে দেশ উদ্ধার সুনিশ্চিত জানিয়া সাধককে অভয় দিয়াছেন কবি—

"তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
জেগে আছেন জগৎপ্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই
ধূলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে॥"

এই ভক্তি-সাধনা আত্মসংযমের পথে চরিত্রের দৃঢ়তার দ্বারাই মাত্র সম্ভব। কর্মীকে সতর্ক করিয়া তাই বাংলার সাধক কবি গাহিয়াছেন—

* বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১......)

"পূত সংযমে বীর বিক্রমে
অতুল কীর্তি রচিবি,
ধর্মের পর নির্ভব কব
এ জগতে যদি বাঁচিবি।"*

বাঙালীর স্বদেশ সেবার আদর্শ, জীবনেব যাহা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তাহাই। আত্মার পরম বিকাশ ও শুদ্ধসত্ত্বরূপে প্রকাশ বাঙালী চাহিয়াছে তাহার দেশ সেবায়। জাতীযতার বড তাহাব ধর্ম নাই। জাতীয়তার বাহিরে তাহাব কর্ম নাই। ইহ, ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব নাই।—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

বাংলার জাতীয়তাবাদেব মতো এত উচ্চ মানদণ্ড পৃথিবীতে কোন অর্থশাস্ত্রে, রাষ্ট্রতত্ত্বে বা ধর্মশাস্ত্রেও বিরল। হার্ডারেব জাতীযতাবাদের উচ্চতম আবেগের ঊর্ধ্বে বাঙালীব এই জাতীয়তার স্বর্ণচুড়া দীপ্যমান। সমগ্র পৃথিবী স্বার্থদ্বন্দ্বে বিলুপ্ত হইতে বসিলেও এই জাতীয়তার আদর্শ উদাত্ত স্বরে মানুষকে আত্মস্থ হইবার প্রেরণা দিবে। সারা জগতের মানব সমাজেব প্রেমসঙ্গীত ও 'নিত্যসত্ত্বস্থ'কারী ধর্মশাস্ত্র এই বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ। ইহা মানুষেব মুক্তি সাধনা। সমস্ত পৃথিবীকে বন্ধনমুক্ত দেখিতে ব্যাগ্র এই স্বদেশপ্রেম। নয়াবাংলার তথা নবভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের মুখে তাই ধ্বনিত হইয়াছে (১৮৩২)—"জাতির মুক্তি ও সমগ্র জগতের মুক্তি দেখিতে

* বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমি একান্ত উদ্‌গ্রীব। রিফর্ম্ বিল * পাশ না হইলে আমি ইংরেজ জাতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম।"

ইহার পরে এক শতাব্দীর অধিক অতীত হইযাছে। কিন্তু মহত্তর কোন বাণী কোন দেশের জাতীযতাবাদীব মুখে এখনও ঘোষণা হয় নাই।

(২)

এই বিরাট ধর্মসাধনায দেশ ও জাতি বলিতে বাঙালী ঋষি কি বুঝিযাছেন? কাহাব জন্য আত্মনাশেব আহ্বান আসিয়াছে ভক্তের উপর? কাহাব উদ্ধারেব জন্য এই ডাক? দেশ কি? দেশ জননীর পবিচয কি? দেশ সেবাব স্বরূপ কি—কাহাব সেবা?—এই প্রশ্নগুলি বিচারেই বঙ্গীয জাতীযতাব যথার্থ পবিচয—এবং সেই মাপকাঠিতেই বর্তমানেব জাতীয়তাবাদিগণকে বিচার কবিতে হইবে। দেশ বলিতে দেশেব মাটী বা বাষ্ট্র-সীমা, না প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অবস্থান বুঝায়? অথবা দেশেব অধিবাসীকে বুঝায়?

বাংলাব জাতীয় চিন্তা এই উভয় ধারাতেই প্রবাহিত হইয়াছে এবং দুই পথেই বাঙালীব সাধনা অবিরোধে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দেশ বলিতে, জাতি বলিতে ধবা হইযাছে এক অভিন্ন সমগ্র সত্তা। জননী ও সন্তানের মধ্যে সংযোগ বহিয়াছে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে। এই সূত্রের সন্ধানেই সাধকের সাফল্য।

---

* এই আইনে গ্রেটব্রিটেনে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয অধিকার বাস্তবিকভাবে স্বীকৃত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই দেশেব প্রকৃত শাসকরূপে পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রীয ক্ষমতা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণেব হাতে আসে পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আর এক আইনে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন বসু পরাধীনতার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া লেখেন—

"দীনের দীন সবার দীন ভারত হ'ল পরাধীন,
তাঁতী কর্মকার করে হাহাকার—
সূতা-জাতী ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

পরাধীনতার এই বর্ণনার মধ্যে স্বাধীনতার একটা দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীর কর্মের ও চিন্তার কেন্দ্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধারণ কারিগরের আর্থিক অধীনতা ও দুর্গতিই পরাধীনতা; এবং জনসাধারণের জীবন-সংগ্রামে এই অসহায় অবস্থার অবসানেই প্রকৃত দেশোদ্ধার।

ঐ বৎসরই 'হিন্দুমেলায়' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গাহেন—

"গাও ভারতের যশোগান,
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন আদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি-রত্নের নিধান?"

আজ হইতে ৮০ বৎসর পূর্বে বাংলার এই দুই জাতীয় ভাবুক স্বদেশের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সমন্বয়ে দেখা যায় স্বদেশ ও জাতি বলিতে একদিকে ভারতের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও সেই সঙ্গে তাহার নামের চারিদিকে ঘেরা যশোসৌরভ আর অন্যদিকে তাহারই বুকে বর্ধিত সন্তান—অগণিত সাধারণ লোকের জীবন-সংগ্রাম। ইহাই জাতীয়তাবাদ। ইহাই দেশাত্মবোধ।

পরবৎসর (১৮৬৮) 'হিন্দুমেলায়' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গাহেন—

"দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর অস্থি-চর্মসার—

'অধীনতা অজ্ঞানতা রাক্ষস দুর্জয়
'শুষিছে শোণিত তার বিদরি হৃদয়।"

দেশজননীর এই যে দৃশ্য ইহার মধ্যে আরও স্পষ্ট হইয়াছে তাহার স্বরূপ—দেশসেবীর সেব্যা কে, সাধকের আবাধ্যা কে ও কোথায় তাহার মন্দিব। দেশের বিত্তহীন স্বাস্থ্যহীন অজ্ঞ শোষিত জনসাধারণ—ইহারাই সাধকের দেশমাতৃকা। জনগণের এই দুঃখ মোচনই দেশোদ্ধার। বাঙালীর জাতীয়তাবাদের মূলকেন্দ্র ইহাই। সন্তানের পবিচয়ে জননীর পরিচয়—জননীর পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়।

স্বদেশ ও জাতির এই ভাবরূপ ও দেশসেবার ত্যাগমূল্য নিরূপিত হইলেও ইহাব বাস্তব রূপ ও কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইতে আরও কিছুদিন সময় লাগে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাব ভিতর দিয়া কর্মীর কাছে ধরা পড়ে। এই অভিজ্ঞতা আসে নীলচাষীর আন্দোলন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে 'ইল্‌বার্ট্‌ বিল' * ইত্যাদি আন্দোলনেব ভিতর দিয়া। এই সময কবিবব হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রণভেরী বাজাইতে থাকেন—

"বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই ববে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌববে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" †

এই আহ্বানে সমবেত হয় দেশপ্রেমিকের দল, যাহাদেব হৃদয়ে বহ্নি আছে কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নাই—যাহারা জানে না আলোকের

---

* ইলবার্ট্‌ বিল এদেশের আদালতে য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গ আর দেশীয় জনগণের বিচার-পদ্ধতিতে বৈষম্য দূব করিবার জন্য উত্থাপিত হয়—কিন্তু ইংরেজগণের সমবেত প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়—১৮৮৩।

† ভারতসঙ্গীত ১৮৭০।

পথ। কিন্তু তাহারা অগ্রসর হয়। ঐক্য ও সাহস সঞ্চার মাত্র হয় এই যাত্রার সম্বল। "ভারতমাতা" নাটিকায় এই পথ দেখাইযা শিশির ঘোষ লিখেন (১৮৭৩)

"কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়—
যতো ধর্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়েব মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়, কি ভয় ?"

ইলবার্ট্ বিল ব্যর্থতার ফলে বাংলাব জাতীয়তাবাদিগণ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করেন যাহা পরবর্তী সংগ্রামে কার্য্যে প্রয়োগ কবা হয়। তাহা সংগঠন শক্তির মূল্যবোধ। ইলবার্ট্ বিল বিফল কবিবার জন্য ভাবতময় ইংবেজগণ সমবেত হইয়া এক দল গঠন কবে এবং ঐ সংগঠনের মারফৎ আন্দোলন চালাইযা কৃতকার্য হয। ভাবতীয়গণেব এই বিরাট পবাজয়ের অভিজ্ঞতাব বাণী হেমচন্দ্র "মন্ত্রেব সাধন" কবিতায় প্রচার কবেন—

"শেখরে এখন ভাবতসন্তান,
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুলমান—
রাজস্তুতি গান সব বিফল।

* * *

যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত একতার ধারা
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ ধারা
হৃদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাখো।"

এই সকল আন্দোলনে সার্থকতা ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া 'রাজ-স্তুতির' নিষ্ফলতা স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা বাংলার কবি ও কর্মীর নিকট সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। কিন্তু সে সংগ্রামের রূপদান ও পরিচালনা আসল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। আপোষরফা ও আবেদন নিবেদনের আন্দোলনে নেতৃত্ব সহজসাধ্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রকৃতি আলাদা। আবার হরিশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গণনেতাদের মৃত্যুতে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া পড়ে। সেই চিত্র তখনকার পল্লীগীতিতে মূর্ত হইয়া ওঠে—

"হায়রে ভাই, প্রজার এবার প্রাণ বাচান ভার,
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার—
নীল-বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার।"

সেই সঙ্কট মুহূর্তে বাংলার জাতীয় আকাশে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। 'বন্দেমাতরম্' লেখা হয় কয়েক বৎসর পূর্বেই, কিন্তু বাঙালী তাহা গ্রহণ করে এই জাতীয়-সঙ্কট ক্ষণে। 'বন্দেমাতরম্' বাঙালীর জাতীয় চিন্তাধারায় যুগান্তর আনে এবং বাঙালীর স্বদেশ প্রেমকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়া স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট পথে সংগ্রামমুখী করিয়া তোলে। এই মন্ত্রে 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' ভূভাগ, তাহার 'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী'র ও 'ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুম-দল শোভিনী' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে সপ্তকোটি সংগ্রামশীল অধিবাসীর 'দ্বি-সপ্তকোটি' হাতে ধৃত খড়্গ দশদিক হইতে আগত শত্রু প্রতিরোধে নিযুক্ত—এইভাবে বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী দেশমাতৃকা সাধকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে। সেই দেশসেবাই সন্তানের বিদ্যা, ধর্ম এবং প্রাণ। সাতকোটি অধিবাসীর হাতে অস্ত্র দিয়া সুসম্বদ্ধ সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিলে তবে দেশোদ্ধার সম্ভব। দেশসেবা ও জাতীয়তাবাদে এইভাবে গণ-সংগঠন ও গণনেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ঋষির দৃষ্টিতে স্পষ্ট উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিয়াছে। দেশের আপামর সাধারণ নরনারীকে শক্তিশালী সংগঠিত ও সংগ্রামমুখী করিয়া তবে এই দেশোদ্ধার।

'বন্দেমাতরমের' গণসংগ্রামের স্বরূপ বঙ্কিম দেখাইয়াছেন 'আনন্দমঠে'। কুশাসনের অভিশাপে একটা ব্যাপক দুর্ভিক্ষের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সন্তানেরা সমবেত হইল সুশৃঙ্খল সংগঠনের পথে এবং প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করিল অত্যাচারী প্রজামঙ্গলে-উদাসীন শাসকশক্তির বিরুদ্ধে। অগ্নি-ঋষির এই ইঙ্গিত পথ দেখাইয়াছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের, পথ দেখাইয়াছে সংগঠনের, পথ দেখাইয়াছে গণবিদ্রোহের। আর ইহাই প্রেরণা দিয়াছে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের।

'বন্দেমাতরমে' বাঙালীর জাতীয়তাবাদ বাস্তব রূপ পাইযাছে। ইহার পূর্বে ছিল সাধকের ধ্যানের এক ভাবমূলক ভারতবর্ষ-প্রীতি, যে ভারতবর্ষ অনাদিকাল হইতে সকল ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া মানবসভ্যতার জ্ঞানবর্তিকা হাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সে ভারতবর্ষ ভুবনমনোমোহিনী; তাহার অকাশেই সামগানের রবে জ্ঞানের প্রথম প্রভাত উদিত হয। কবি তাহার স্তব করিযাছেন—

"চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্য পীযূষ-স্তন্য বাহিনী।"

কবির এই ধ্যানের ছবি যুগযুগান্তর ধরিয়া পৃথিবীতে সাম্যের, জ্ঞানের, ঐশ্বর্যের ও শ্রেয়ের ঐক্যের সহায়ক। কিন্তু বাস্তব রাষ্ট্রক্ষেত্রে বা সামাজিকক্ষেত্রে কর্মীর জন্য ইহা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপন্থার সন্ধান দেয় না। এ ভারতবর্ষ অতীন্দ্রিয় জগতের রসরূপ—কোন বাস্তব রাষ্ট্রনেতার কর্মভূমি নয়। বাস্তব মাটির দেশের সন্ধান পাই বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে এবং তাঁহার 'দুর্গোৎসবে' মাতৃসাধনায়।

দেশের সীমা নির্দেশ হইয়াছে সপ্তকোটি বাঙালীর বাসভূমি বঙ্গদেশ; এবং এই দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি উদ্ঘাটন করিয়া দেশসেবীর আদর্শ ও কর্তব্য নির্ধারণ হইয়াছে এই মন্ত্রে। সপ্তকোটি বাঙালীর সমবেত প্রচেষ্টায় আর অনন্যা ভক্তি ও নিষ্ঠায় এই আদর্শে পৌঁছান সম্ভব।

বঙ্কিমের এই সপ্তকোটির বাংলা আজিকার বাংলার সীমারেখা হইতে পৃথক। তখনকার বাংলার চৌহদ্দির মধ্যে বর্তমান বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র ভূভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বঙ্গদেশের জনসংখ্যা ছিল সেই যুগে সাত কোটি। সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চল, বিহারের সাঁওতাল প্রভৃতি ভাষা-ও-গোষ্ঠী-তত্ত্বে বাঙালীর অতি অন্তরঙ্গ আদিম অধিবাসীবৃন্দ এবং আসামের অহমীয়াগণ লইয়া বঙ্কিমের এই সপ্তকোটি। আসামের ভাষা বাংলার স্বগোত্র, আর অক্ষর একই। বাংলা ও স্বগোত্র (যেমন অসমীয়া, উড়িয়া ও সাঁওতালী) ভাষা ব্যবহারে বঙ্কিমের সপ্তকোটির বঙ্গদেশ এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত। ভারতবর্ষের অপর কোন সাংস্কৃতিক পরিবার উহার অর্ধেক সমৃদ্ধিও দাবী করিতে পারে না। সপ্তকোটি আজ দ্বাদশ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের উত্তরসাধকেরা তাঁহার বঙ্গদেশের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য বর্ধন করিতে পারে নাই। বিহার-কংগ্রেসের প্রচারের ফলে এবং উহার সমর্থনে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 'রাষ্ট্রভাষা' প্রচারের বলে আজ বিহারে বাংলার সমভাষীকে দেবনাগরী হরফ মারফৎ হিন্দুস্থানী বনাম হিন্দীভাষাভুক্ত করা হইতেছে; আর বাঙালী ইহার নিষ্ক্রিয় দর্শক সাজিয়া সর্বভারতীয় বৃহৎ স্বার্থের গৌরবময় যূপকাষ্ঠের আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাষা ও সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আসামও কালের প্রবাহে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, যদিও আসামে বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা অসমীয় অধিবাসীর দ্বিগুণ। এই সকল

বিষয় বিবেচনায় আজ বঙ্কিমের নিরূপিত সপ্তকোটির দেশ আট কোটির দেশে পুনর্গঠিত হইতে পারে এবং তাহার সীমানির্ধারণ হয় এইভাবে—চট্টগ্রাম পাহাড়, ত্রিপুরা রাজ্য, সম্পূর্ণ সুরমা উপত্যকা, গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং ডরং ও নওগংএর অংশবিশেষ পূর্ব সীমানার অন্তর্গত হইবে। পশ্চিম সীমানাব অন্তর্ভুক্ত হইবে সম্পূর্ণ পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, ও সিংহভূম এবং ভাগলপুর, ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বরের অংশবিশেষ। ছোটনাগপুরের অধিবাসীকে স্বাধীনভাবে মত প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে, সে বঙ্গগোষ্ঠীব সহিত সংযুক্ত হইতে চায় কিনা।

অগ্নি-ঋষিব এই মন্ত্র পাইযা বাঙালী দেশপ্রেমিক 'সন্তান' সেদিন সংগ্রামের দুন্দুভি বাজায়। দেশকে দেখে বাঙালী সত্যরূপে। জানে যে, স্বাধীনতাব কর্মস্থল দেশবাসীর আঙ্গিনা। সেখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই—আছে কেবল সপ্তকোটি দেশবাসী। লক্ষ্য সেখানে দ্বি-সপ্তকোটিভুজ-ধৃত খড়্গ। এই দেশাত্মবোধেই আবির্ভূত হয় বাংলাব গৌরবময স্বদেশী বিপ্লব। ধ্যানেব কল্পজগৎ ছাড়িযা বাঙালী ঝাঁপাইযা পড়ে বাস্তব রাষ্ট্রনীতিতে। সে দেখা পায আপনাব মাকে, তাহার জন্মদাত্রীকে। কবি তাই উচ্ছ্বাসে গাহিযা ওঠেন—

"আমাব সোণাব বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমাব আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥

* * *

ও মা ফাল্গুনে তোর আমেব বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা অঘ্রাণে তোর ভবা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি

* ` * *

ও মা **আমার যে ভাই তারা সবাই**

তোমার রাখাল, তোমার চাষী।"

এই দেশের প্রশস্তি গাহিয়া বাংলার প্রেমিক কবি স্বজাতির কৌলিন্য ঘোষণা করিয়াছেন—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"*

এই দেশের দুঃখে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে কবি বলিয়াছেন—

"সপ্তকোটি সন্তান যাব ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?"

আবাব তরুণ বাঙালী কবি এই দেশের ও জাতির বৈশিষ্ট্য ও ঐক্যের সূত্র খুঁজিয়া পাইয়া গাহিয়াছেন—

"কোন ভাষা মরমে পশি
আকুল করি তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব
বাউল সুরের মধুর গান?
চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরই বাংলা রে।" +

বাংলাব জল বাতাসের বিশেষ স্নেহ ধারার কোমল স্পর্শে প্রেম-রসে সঞ্জীবিত বাঙালীর স্নিগ্ধ মধুর সঙ্গীতেব বাহন বঙ্গভাষা বাঙালীর সুদৃঢ়

---

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

\+ সত্যেন দত্ত।

ঐক্যের রাখীবন্ধন করিয়াছে। কবি তাই পরম বিশ্বাসে এই ঐক্যের জয় ঘোষণা করিয়াছেন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—

"বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান॥

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক, হে ভগবান॥"

আবার কবির সঙ্গে ঐক্যতানে বাঙালী পল্লীব্রতীর দল গাহিয়া নাচিয়াছে—

"বাংলার মাটি, বাংলার হাওয়া, বাংলার ভাষা, বাংলার গান
বাংলার নদীর সলিল-ধারা সফল হোক, হে ভগবান।
বাংলার ছেলে মেয়ে লভুক দেহের শক্তি মনের জ্ঞান;
বাংলার মায়ের স্তন্য দুগ্ধে গড়ে উঠুক বীরের প্রাণ।
বাংলার পুরুষ নারী করুক দেশের সেবায় আত্মদান;
বাংলার হিন্দু-মুসলমানের প্রাণে বহুক প্রেমের বান।

বাংলার গৃহে গড়ে উঠুক ধনে পুণ্যে ঋদ্ধিমান;
বাংলার জীবন হয়ে উঠুক ধর্মে কর্মে মহীয়ান।"*

---

* গুরুসদয় দত্ত।

(৩)

বঙ্কিম, 'বন্দেমাতরম্' ও 'আনন্দমঠে'র উপর একটা বিরূপ ও বিরোধের ভাব কিছুদিন হইল এদেশের একদল রাষ্ট্রীয় কর্মীর মনে উদিত হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, বঙ্কিম ছিলেন মুসলমান-বিদ্বেষী, 'বন্দেমাতরম্' হিন্দু-জাতীয়তাবাদ তথা হিন্দুধর্ম প্রচার, এবং 'আনন্দমঠ' ভারতের বা বাংলার মুসলমানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক জেহাদ মাত্র। এই অভিযোগে চিন্তার দৈন্য স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক আচ্ছন্ন-দৃষ্টির আবরণ যেদিন কাটিয়া যাইবে সেদিন এই দলও উজ্জ্বল দিবালোকে বঙ্কিম-প্রতিভার নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া আজিকার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

আনন্দমঠে 'সন্তান'দল যাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে তাহাদিগকে 'যবন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই যে যবন, ইহারা বাংলার বঞ্চিত ক্ষুধিত অজ্ঞ সবলপ্রাণ ধর্মভীরু মুসলমান জনসাধারণ নয়। ইহারা পরদেশী, অত্যাচারী, লম্পট, উচ্ছৃঙ্খল, স্বাধীনতার শত্রু কুশাসকের আজ্ঞাবহ। যবন বলিতে বুঝান হইয়াছে ঘৃণ্য, পশ্চিম হইতে আগত মুসলমান, ইংরেজ, তৈলঙ্গী ও 'পশ্চিমা' হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশীকে।* তাহার ধর্ম বিচার করা হয় নাই। ঘটনাক্রমে কেহ কেহ নামে মাত্র মুসলমান হইলেও ইসলামের পবিত্র আবেদন

---

* "অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারিজন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

"ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছেন। ভবানন্দ বলিলেন, ভাই, নেড়ে ভাগিতেছে, চল, একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি। তখন পিপীলিকা স্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুলপারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল।......তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল।

ও চরিত্রবল তাহাদের ছিল না। কাজেই তাহারা ধর্মহীন 'যবন'। এই অর্থেই 'যবন' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি গ্রন্থে। কোন সুশাসক মুসলমান নরপতির বিরুদ্ধে বঙ্কিমের লেখনী ধর্মের উন্মত্ততা প্রচার করিতে উদ্যত হয় নাই। ঈশা খাঁ, আলীবর্দী, হুসেন শাহ্ প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাতীয়তার ঋষি লেখনী ধারণ করেন নাই। 'আনন্দমঠে' দুই এক জায়গায় 'নেড়ে' শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। এও বাংলার মাঠের চাষী ভগবৎনিষ্ঠ মুসলমান কৃষক নয়। এ 'নেড়ে' চরিত্রহীন, অত্যাচারীর পেশাদার ভাড়াটিয়া সৈন্য †—দেশ বা স্বজাতিভক্ত শ্রমজীবী কোন প্রজা নয়। তাহা ছাড়া উপন্যাসের কোন সাধারণ বা নিম্ন পর্যায়ের নায়কের মুখে অসংযত ক্রুদ্ধ বা ঘৃণার উক্তি লেখকের নিজের মত বলিয়া ধরিয়া লওয়ার মতো সাহিত্য বিচারে অক্ষমতা আর হয় না। রণক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক করিবার জন্য সৈন্যদলের নিকট সেনাপতির অসংযত উক্তি ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবে আজও অস্বীকৃত হয় নাই। আয়েষা ও ওসমান চরিত্রের স্রষ্টাকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলা স্বীয় চিন্তার দৈন্য প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

বঙ্কিম ছিলেন জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার পূজারী ঋষি। তাই যেখানে যে শক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে সেই পাইয়াছে স্রষ্টার

আর কিছু টিঁকিল না—বল, বীর্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল"—'আনন্দমঠ'—২য় খণ্ড—১১শ পরিচ্ছেদ।

[বঙ্কিমের 'যবন' আর 'নেড়ের' প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় এই বর্ণনাতে এত স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে যে ইহার মধ্যে মুসলমান-বিদ্বেষ খোঁজ করা মতলববাজী ব্যতীত আর কিছু নয়।]

† পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রমাণ উদ্ধৃত।

সহানুভূতি এবং তাহার শত্রু হইয়াছে ঘৃণ্য অমানুষ। পরাধীনতার অভিশাপগ্রস্ত দেশে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা দিবার জন্য যে কাল্পনিক ও ইতিহাস-কল্পনা মিশ্রিত কাহিনী রচনা সেদিন সম্ভব হইয়াছে ও সেদিনের শিশু বঙ্গ সাহিত্যে খাপ খাওয়ান গিয়াছে সেই কাহিনীর ভিতর দিয়াই অগ্নি-ঋষি স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রদান করিয়াছেন। রাজা যদি অত্যাচারী হয় ও প্রজামঙ্গলপর না হয় তবে সে হন্তব্য, এই সনাতন নীতি তিনি রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্কিমের লেখনী তাই শত শত বাঙালী সন্তানকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলি দিবার জন্য ডাক দিয়াছে, কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নাই। 'আনন্দমঠে'র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত কোন বাঙালী দেশপ্রেমিক মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচার করে নাই বা কোনরূপ সাম্প্রদায়িক মুক্তির স্বপ্ন দেখে নাই। সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইয়াছে তাহারা যাহারা এই মন্ত্র গ্রহণ করে নাই বা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয় নাই। বাঙালী দেশভক্তের নিকট ফষ্টর ও তাহার স্বগোত্র সাদা-কালা লম্পটের দল হইয়াছে চিরশত্রু,—কোন মুসলমান প্রজা নয়। বঙ্কিম-লেখনীর এই ফলাফল বিচারেও এবং প্রকৃতপক্ষে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র কি প্রেরণা দিয়াছে এই বিচারেও বঙ্কিম-বিরোধিতার অবসান হওয়া উচিত। বঙ্কিম ব্যতীত বাংলার জাতীয়তাবাদ ও বাংলার স্বদেশ সেবা শিবহীন যজ্ঞ। বঙ্কিমকে অস্বীকার করিয়া বাংলার সাহিত্য নাই, বাঙালী জাতি নাই।

সপ্তকোটি অধিবাসীর সমগ্র সত্তা বঙ্কিমের স্বদেশ। তাহারা সুজলা সুফলা মনোরম দেশের অধিকারী—বিদ্যা-অর্থ-জ্ঞান-বীর্য সমন্বিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দশ দিকে শত্রু প্রতিরোধে প্রস্তুত। এই দেশকে উদ্ধার করিতে হইবে অন্ধকারে নিমজ্জিত অতল সমুদ্র হইতে। এই

দেশ মানুষকে বাদ দিয়া কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। আবার পৃথিবীর জলমাটি বাদ দিয়া শুধু কতকগুলি এক গোত্রের মানুষ লইয়া জাতি নয়। এই জাতি বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ আধুনিক একটা রাষ্ট্র। 'বন্দেমাতরমে'র জাতীয়তা হার্ডার-বিসমার্কের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা।

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পদ্ধতি সম্বন্ধেও বঙ্কিম "পলিটিক্স" প্রবন্ধে কঠোর বিদ্রূপের কশাঘাতে পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বলবানের নিকট আবেদন-নিবেদন, তোষণ ও আপোষ-আলোচনা নিষ্ফল। আবার লোভী পরস্বাপহারকের নিকট নিরুপদ্রব প্রতিবাদও নিরর্থক—এই সত্য প্রকাশ হইয়াছে বঙ্কিমের লেখনীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের অনেক আগে।

'বন্দেমাতরমের' ভূভাগ ও অধিবাসীর সমন্বয়ে বাস্তব জাতীয়তাবাদ দেশের কোন কৃত্রিম বিভাগ স্বীকার করে নাই। ভাষা, গোষ্ঠী, জীবন-যাত্রার প্রবণতা, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও অতীত ঐতিহ্যের ধারা যেখানে এক, সম্পদে-বিপদে সুখে-দুঃখে যে দেশ যে জাতি এক স্বার্থে জড়িত সেখানে কোন বিচ্ছেদ বরদাস্ত হইতে পারে না। নদীনালার সীমানাভাগ বা ধর্মের নামে জাতিভাগ 'বন্দেমাতরম্'এর জাতীয়তা বিরোধী। সপ্তকোটি হিন্দুমুসলমানের স্বতন্ত্র সত্তা এক সূত্রে গাঁথা। তাই এই দৃঢ় নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের আশ্রয়ে যখন বাঙালী দেশসেবী রণ-দামামা বাজাইয়া দেয় তখন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্ত্র কবির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ?

* * * *

মান অপমান ঘুচে গেছে—
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।"

এই মিলন বীথী দৃঢ় করিতে কবি বাঙালীকে ডাক দেন—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎজনের হৃদয় জুড়াক।

* * * *

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।"

ব্যর্থ হইয়া যায় শাসকের কূটকৌশল, ফিরিয়া যায় তাহার বিভেদ-কীলক। আর হিন্দু-মুসলমানের শোণিতে রাঙান বাঙালীর ঐক্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন বিদ্রোহী কবি—

"কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।"

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসক নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। দেশবাসীর মনে সন্দেহ জাগাইয়া সে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির শতলক্ষ ফন্দি আঁটিতে থাকে। বিদ্রোহী কবি তাই সতর্ক করিয়া দেন সংগ্রামীকে—জাতীয় যুদ্ধের সৈনিককে—

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী, আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ,

'হিন্দু, না ওরা মুসলিম ?' এই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কাণ্ডারী, বল, 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার' ।"

মায়ের সন্তানকে বিবিধ ছলে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার বন্ধনরজ্জু ও শোষণযন্ত্র কায়েম রাখার আয়োজনে বিদ্রোহী বাঙালী দেশপ্রেমিক ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছে, ইহাদের ফেলিয়া রাখিয়া সঙ্কীর্ণ পথের ক্ষুদ্র আওতায় যদি জাতীয়তাবাদী দেশসেবী চলিয়া যায়, তবে সে শোষকের ফাঁদে পড়িয়া সব ভরাডুবি করিয়া বসিবে—জাতীয়তাবিরোধী আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া আত্মঘাতী নীতির জয়গান গাহিতে গাহিতে আত্মবিরোধের বিদ্বেষবহ্নিতে জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিবে। বিদ্রোহী কবি তাই আবার দেশভক্ত কর্মীকে সতর্ক করিয়া ডাকিয়াছেন—

"গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী, তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথমাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়েছ যে মহাভার।

* * * *

আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার !"

বাংলার জাতীয়তার মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়াছে বিদ্রোহী কবির এই হুঁশিয়ারীর মধ্যে। এই সতর্ক বাণী অবহেলা করিলে বাঙালীর সমগ্র সত্তা বিলুপ্ত হইবে এবং বাংলার সকল সাধনা নিষ্ফল হইবে।

'বন্দেমাতরম'এ হিন্দুধর্ম প্রচার দূরে থাক, হিন্দুধর্মের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া-কর্ম সমস্ত অস্বীকার করা হইয়াছে। দেব-আরাধনার স্থলে দেশমাতৃকার আরাধনা, দেহে পরমাত্মার আসনে দেশাত্মা আর

বাহিরে দেবতার আসনে দেশপ্রেমকে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্মের স্থলে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান জনগণের মিলিত এক বিরাট জতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক ধর্ম বাঙালীর নিকট উত্থাপন করা হইয়াছে। এই ধর্মের বহিঃপ্রকাশ বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতি। ইহাকে যে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করে সে 'বন্দেমাতরম্'এর সত্যরূপ অস্বীকার করে। সে বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদের শত্রু—কপট দেশভক্ত। তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বিদ্রোহী কবি কষাঘাত হানিয়াছেন—

"(মার) বন্ধ ঘরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'ল দুই নয়ান।
(তোরা) শুনতে পেয়েও শুনলিনে তা, মাতৃহন্তা কুসন্তান॥"

(৪)

বাংলার জাতীয়তাবাদের সত্যরূপ বাঙালীর এক-সত্তা বোধ। ধর্মমত যতই থাক, বাঙালী বাঙালী। বাংলার জলবাতাস, বাংলার সবুজ মাঠ, বাংলার সুখ-দুঃখ, আধিব্যাধি, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, বাংলার জলাভূমিতে নিদাঘে জলাভাব—বাংলার অধিবাসীকে এক বিশেষ ধারায় একই পথে বাঁধিয়াছে। এই ঐক্যের বন্ধনমূল বাঙালীর এক গোষ্ঠীতত্ত্ব ও এক ভাষা-সাহিত্য। এই সাহিত্যের সাধনায় জীবনপাত করিয়াছেন কবি আলাওয়াল হইতে কবি নজরুল-জসীম, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস হইতে সুরু করিয়া মহা মহা দিকপালগণ। বাংলার বাউল, বাংলার ভাটিয়ালী বাংলার আকাশে বাতাসে দিয়াছে প্রাণশক্তি। লখীন্দরের কাহিনী শুনিতে চায় না, বা বেহুলার একাকিনী ভেলায় ভাসা যাত্রাপথে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সকরুণ মন অনুসরণ করে না এমন বাঙালী নাই।

এই ভাষা-সাহিত্যের বন্ধনে পরিবেষ্টিত ভূমি বাংলাদেশ। এ দেশের অধিবাসী বাঙালী জাতি এবং এই দেশ ও জাতি লইয়া

বঙ্গজননী। আর সেই দেশমাতৃকার ঐক্য ও উন্নতি চিন্তা বাংলার জাতীয়তাবাদ এবং তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণ বাংলার জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।

জাতীয় মুক্তির রূপ সম্বন্ধে বাংলার প্রতিভা ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় মুক্তি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিষয় মনে করিয়াছেন। "আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। ....নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চরিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটা ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।"*

এখানে রবীন্দ্রনাথ নেশন গঠন বলিতে বুঝিয়াছেন উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যাহা জাতীয়তাবাদ বলিয়া শাসকশক্তি চালাইয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার যে বনিয়াদ প্রেমের উপর গড়া তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা রাষ্ট্র গঠন নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ঐক্যেই যে পরমার্থ লাভ ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে তিনি অস্বীকার করিতেও পারেন নাই এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতির অস্বাভাবিক বিচ্ছেদও বরদাস্ত করেন নাই। ভারতীয় সভ্যতার জন্য রাষ্ট্রীয় ঐক্য তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালী জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাই সমস্ত শক্তি লইয়া কবি বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

মানুষের আন্তরিক ঐক্যই জাতীয়তার প্রধান কথা। রাষ্ট্র স্থাপন বা "য়ুরোপীয় ছাঁদের" নেশন গঠনে যদি সেই ঐক্যে ব্যাঘাত আসে

---

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (স্বদেশ)

তবে জাতীয়তাবাদের সর্বনাশ এবং উহা সভ্যতার বিকাশে পরিপন্থী। যে নেশনের রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করিয়াছেন তাহা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিভাগে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের জন্য প্রতিষ্ঠিত নয়। উহার লক্ষ্য অস্ত্রবলে একটা বিশেষ সীমারেখায় পরিবেষ্টিত ভূভাগ শাসন। নেশনের এই ব্যাখ্যা দেখা যায় অধ্যাপক বিনয় সরকারের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে।* তাঁহার মতে নেশনের কোন বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা সম্ভব নয় বা খাঁটি নেশন মাফিক রাষ্ট্র গঠনও সম্ভব হয় না। "ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের চৌহদ্দি বা সীমানা মাফিক রাষ্ট্র, 'ষ্টেট' বা শাসন-ব্যবস্থা একালে-সেকালে কয়টা দেখা যায়? পাচ হাজার বছরের দুনিয়ার ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে না। একালেও দৃষ্টান্ত নেহাৎ কম। একমাত্র ভাষা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বস্তুর সীমানা দেখিয়া কোন রাষ্ট্রের চতুঃসীমা, গড়ন বা চৌহদ্দি মাপিয়া দেওয়া প্রায়ই অসম্ভব।" সেইজন্য তিনি নেশন বা জাতি বলিতে বুঝিতে চাহিয়াছেন, যে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত একটা রাষ্ট্র যাহা রক্ষার জন্য থাকিবে একটা শক্তিশালী সেনাদল। এক একটা স্বতন্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক-বাহিনী এক একটা রাষ্ট্রের পরিচায়ক; এবং কার্যত নেশন ও রাষ্ট্র এক। "নেশন (জাতি) শব্দটা ব্যবহার করাই ঝকমারি। চলনসই শব্দ হইতেছে 'স্টেট' (রাষ্ট্র)। আর সেই 'স্টেটের' চৌহদ্দির ভিতর থাকে 'বার রাজপুতের তের হাঁড়ি'। গণ্ডা গণ্ডা ভাষা লইয়া চলে রাষ্ট্র, গণ্ডা গণ্ডা সংস্কৃতি লইয়া চলে রাষ্ট্র।............'জাতীয়তা' শব্দ যদি ব্যবহার করিতেই হয় তাহা হইলে ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বস্তুর কথা না তোলাই বাঞ্ছনীয়। বুঝা উচিত যে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দেশের স্বাধীনতা, এক-রাষ্ট্রীয়তা, এক-দেশীয়তা বলা হইতেছে।......

* Politics of Boundaries.

'নেশন'-দর্শনে মাতামাতি করিবার সময় 'স্টেট'-দর্শনের জাত মারিয়া যাওয়া উচিত নয়।"*

রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছেদশক্তি প্রবল হইলে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আবার নূতন রাষ্ট্র স্থাপন চলিতে পারে, আর সেই সঙ্গে হয় নূতন নেশন সৃষ্টি। সুরেন্দ্রনাথ 'সৃষ্টির মুখে জাতি' ('A Nation in the Making') বলিতে বুঝিয়াছেন এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবদ্ধ জাতি। মাজারিকএর (Masaryk—1859-1937) 'Making of a Nation'-গ্রন্থেও এইরূপ চেক্ (Czech) জাতীয়তার কথাই বলা হইয়াছে। এই নেশন-সৃষ্টির জন্য দরকার বিশ্বশক্তির যুযুধান জাতিগুলির মধ্যেকার বিবাদের সুকৌশল সদ্ব্যবহার। অধ্যাপক বিনয় সরকার ভারতবর্ষে এইরূপ একাধিক রাষ্ট্র বা নেশন গড়িবার সুপারিশ করিয়াছেন। † রাষ্ট্র গড়নের জন্য সাংস্কৃতিক কোন মান গ্রহণ করিতে গেলেই মহা গোল। এই চেষ্টা তাঁহার মতে "কট্টর হার্ডার পন্থীর" অবাস্তব চিন্তা।

রাষ্ট্র ও নেশনের এই নির্দেশে রাজনীতিতে বাস্তবতা বোধের পরিচয় থাকিলেও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামীর জন্য প্রেরণা ও কর্তব্য নির্দেশ নাই। একটা নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইলে রাষ্ট্রনীতির বিচারে নূতন নেশন হয় সত্য, কিন্তু সেই নেশন বা রাষ্ট্র গড়ার প্রবণতা ও প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? কিসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-স্থাপন বা জাতীয় ঐক্যবোধ প্রচারের চেষ্টা হইবে? এইরূপ নেশনের লক্ষ্য ও আদর্শ কি হইতে পারে? বা এই সকল যুযুধান নেশন লইয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা কি উপায়ে সম্ভব? কূটনীতির খেলা (Power politics) কি মানব সভ্যতায় চিরন্তন সত্য?

* দিলীপ মালাকারের "জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডার" পুস্তিকার ভূমিকা।

† 'ত্র্যাদয়ের দর্শন'।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'না'। মানুষের সভ্যতার অভিব্যক্তি তাহার আত্মার মুক্তিতে, সত্য ও সুন্দরের বিকাশে। যে রাষ্ট্র গঠনে অন্যায় ও মিথ্যার আধিপত্য তাহার মজ্জার মধ্যে আছে নিষ্ঠুরতা। তাহাতে সভ্যতার বিকাশ নাই। রাষ্ট্র ও নেশনের এই সকল বাস্তববাদী ব্যাখ্যায় এই নিষ্ঠুরতা উৎপাটনের সুযোগ নাই। এদেশের সভ্যতার ধারায় রাষ্ট্রের প্রভাব প্রবল হয় নাই বলিয়াই রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়াও আমাদের সংস্কৃতির কোমল বৃত্তিগুলি আজও অক্ষত আছে। অতএব আমরা স্বাধীন থাকি বা পরাধীন হই, আমাদের জাতীয় সত্তায় তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই রাষ্ট্র-নিরপেক্ষতা বেশী দূর টানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। কারণ একদিকে পরাধীন অবস্থায় রাজশক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমাজ আজ আর সমর্থ নাই এবং অপরদিকে অতীতের রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিলেও গতিহীন হইয়া অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছে, কোনরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

'বন্দেমাতরমের' জাতীয়তাবাদে এই বিরোধের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আবেদন ইহাতে আছে। কিন্তু সে রাষ্ট্রের আদর্শ একটা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক পর্যায়ের এবং উহার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগে লওয়া হইয়াছে দেশের সমগ্র জনগণকে। যেন-তেন ভাবে একটা রাষ্ট্র গঠনে নিষ্ঠুরতা আছে, সীমারেখা লইয়া জাতির আত্মকলহ আছে। উহাতে সাধারণ লোকের কোন উৎসাহ থাকে না—সর্বহারা সেদিকে দৃকপাত করে না। উপর হইতে মতলববাজের মধ্যে স্বার্থে রক্ষা হইয়া যায়। তাহারা লোভ দিয়া, ভয় দেখাইয়া, হুমকি দিয়া ও যাবতীয় মিথ্যা প্রচারের আশ্রয়ে নিষ্ঠুর কৌশলে কার্যোদ্ধার করিয়া লয়। ইহাই শোষণতন্ত্র—স্বদেশী হোক, বা বিদেশী হোক। 'বন্দেমাতরম্' এই জাতীয়তাবোধের ঊর্ধ্বে।

(৫)

এইখানে জাতীয়তায় নেতৃত্বের প্রশ্ন ওঠে। জাতীয়তা কতিপয় বিত্তশালী শিক্ষিত পণ্ডিতের ঘরোয়া বিষয় নয়। উহা সমগ্র জনগণের ধর্ম, ও বিকাশের বাহন। জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টি ও আশ্রয় সর্বসাধারণের মধ্যে। উহা সম্পূর্ণই গণতান্ত্রিক।* কিন্তু এই গণতন্ত্রের স্বরূপ পার্লামেণ্টারী শাসন নহে। পার্লামেণ্টের ভোটাভুটিতে এ গণতন্ত্র আসে না। এ গণতন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা, অভিব্যক্তি ও পরিচালনা পার্লামেণ্টারী ধারায় নয়। উহাব ঘোষণা গণপরিষদে, প্রতিষ্ঠা পল্লী গণসমিতিতে এবং উহার অভিব্যক্তি লোক-সাহিত্যে। এই 'গণ' বা 'লোক' সমাজের দুর্বৃত্ত বা ইতর শ্রেণী নহে। ইহারা সাধাবণ লোক, সাচ্চা লোক—পল্লীব প্রাণ, জাতির মেরুদণ্ড। হার্ডারের ফোল্‌ক্ (Volk) তত্ত্ব এই গণতন্ত্র যাহার জন্য কোন পার্লামেণ্ট দরকার হয় নাই। 'বন্দেমাতরমের' 'সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল নিনাদ' এই গণ-অভ্যুত্থান। ইহারা দেশের দুশ্চরিত্র ইতর লোক নয়। ইহারা আবাব 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর সুবিধাবাদী নির্জীব পদার্থও নহে—ইহারা দেশজননীর সন্তান। জাতীয় জীবনে নিম্ন-শ্রেণীর সাধারণ লোকের প্রতি অবজ্ঞা বঙ্কিমের চোখে ধরা পড়ে এবং এই অসঙ্গতি দূর না হইলে জাতির উন্নতি নাই, এ সত্য ঋষি স্পষ্ট দেখিতে পান। তাই বঙ্গদর্শনে তিনি লেখেন—"এক্ষণে আমাদিগের ভিতর উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের

---

* "Modern nationalism is essentially democratic"—Hocking—Lasting Elements of Individualism, 1937.

কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।"

গণনেতৃত্ব বাংলাদেশে আজিকার নূতন নয়। ইহা বঙ্কিমেরও পূর্ববর্তী। নীলচাষীর সংগ্রাম ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন ছিল না। উহা ছিল চাষীকৃষকের আন্দোলন যাহারা অত্যাচার প্রতিরোধ করিয়া দুঃখবরণ করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষভাবে শাসন-যন্ত্রের বড়কর্তার নিকট অভিযোগ করিয়া প্রতিকার দাবী করিয়াছে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে যে নেতারা ছিলেন তাঁহাদের ধরণও ছিল গণ-নেতৃত্বের। তাঁহারা জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ দাবী তুলিতে শিক্ষা দিয়াছেন—প্রতিনিধিত্ব করিবার আশায় উৎফুল্ল হন নাই। বরং জনগণ যাহাতে নিজেরাই দাবী আদায় করিয়া লইতে পারে সেই শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সংঘবদ্ধ জনশক্তি এত প্রবল হইয়াছিল যে বাংলার তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গবর্ণর স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের এক রিপোর্টে (১৮৬০), এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"......numerous crowds of Rayats at various places whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate Indigo. On my return a few days afterwards.........from dawn to dusk as I steamed along these two rivers (Kumar and Kaliganga) for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves.......... ....I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a con-

tinued double street of suppliants of justice. It would be a folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people—men, women and children has no deep meaning." [অসংখ্য রায়তের ভীড় নানাস্থানে প্রতীক্ষমান যাহাদের একমাত্র আবেদন যে, সরকার এক আদেশনামা জারি করিয়া নীল চাষ বন্ধ করিয়া দিক।......কয়েক দিন পরে ফিরাব পথে প্রত্যুষ হইতে প্রদোষ পর্যন্ত যতক্ষণ এই দুইটি নদী (কুমার ও কালীগঙ্গা) বাহিয়া আসি প্রায় ৬০।৭০ মাইল পথ ষ্টীমারে অতিক্রম করিতে থাকি ততক্ষণই (নদীর) উভয় তীর এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থী গ্রামবাসীর সমাবেশে পূর্ণ ছিল। এমন কি মেয়েরাও নদীর তীরের গ্রামসমূহ হইতে আসিয়া দলে দলে জড় হয়। ভারতের কোন পদস্থ রাজকর্মচারীর ভাগ্যে এমন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই যে তাহাকে ১৪ ঘণ্টাকাল উভয়পার্শ্বে বিচারপ্রার্থীর নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে। হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবণিতা জনসাধারণের এই মহড়াব কোন গভীর তাৎপর্য নাই মনে করা মূর্খতার কাজ হইবে।"]

প্রজার এই সংঘবদ্ধতায় বড়লাট লর্ড ক্যানিং সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও বেশী শঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ দেখেন।* এই গণ-নেতৃত্বের ফল হইয়াছিল অবশ্যম্ভাবী। নীল-কুঠীয়ালের অত্যাচার ও ইংরেজের বর্ণ-বৈষম্য দূর করিতে সমর্থ হয় এই গণ-জাগরণ।

বাংলার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কত ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং বাংলার জাতীয়তাবাদীর চিন্তায় গণনেতৃত্ব

* হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—১ম খণ্ড—১১৭ পৃঃ।

কত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় (১৮৮৭) অধিবেশনে অশ্বিনী কুমার দত্তের বক্তৃতায় তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

"আমি আপনাদের নিকট ৪৫,০০০ লোকের সহিযুক্ত একখানি নিবেদন আনিয়াছি। যখন তাঁহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়াছি—একজন চণ্ডাল আসিয়া বলেন, বাবু, আমাদের নিজেদের লোক আইন প্রস্তুত করিবে? কি ভাগ্যের কথা, একজন দীনদরিদ্র মোসলমান চার আনার পয়সা দিয়া বলেন, বাবু, ইহা আপনাদের কাজে লাগাইবেন। আর একজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে, দেখ, যেমন আমরা পঞ্চায়তি করি ও পঞ্চায়তি বিচার মানিয়া লই তেমন আমাদের দেশের লোক আইন করিবেন আর আমরাও খুসী হইয়া মানিয়া লইব। আপনারা দেখুন, সাধারণ লোক এই বিষয়ে কিরূপ আগ্রহান্বিত।"*

'বন্দেমাতরমের' এই গণসংযোগের দিকটা আমাদের জাতীয়তাবাদীর সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফলে গত ২৫।৩০ বৎসর বাংলায় রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ব্যর্থ আবর্তে ঘুরিয়া পরিশেষে আত্মদ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। গণনেতৃত্ব ও গণসংযোগের প্রধান কথা (১) অর্থনৈতিক পরাধীনতা দূর করিয়া নিঃশঙ্ক জীবনযাত্রার জন্য পরিকল্পনা করা এবং (২) সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত করা, অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণের দাবীর অভিব্যক্তি হইবে এই আন্দোলন ও নেতৃত্বের মাধ্যমে। জনসাধারণ এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। সংগ্রামে

* হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—১ম খণ্ড—১১৭ পৃঃ।

-যোগ দেওয়ার পূর্বে সকলের আগে স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহিবে কিসের বিরুদ্ধে এবং কিসের জন্য লড়াই। প্রচলিত উৎপাদন ও ধনবণ্টন ব্যবস্থা, আইন-কানুন এবং সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে কিনা বা সেগুলির বদলে নূতন সমাজ বিধানের কোন পরিকল্পনা তাহাতে আছে কিনা। থাকিলে তাহারা সেগুলি সহজ গ্রাম্য-ভাষায় ঘোষণা করিবার দাবী করিবে। চলতি ব্যবস্থায় যাহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, চলতি আইন-কানুনের আওতায় যাহারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে এবং সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ণ দেখে, জন-সাধারণ জানে যে, তাহাদের নেতৃত্বে সংগ্রাম দুর্বল হইবেই। কারণ সঙ্কটের দিনে বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাবে তাহারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বসিবে।

গণ-সংগ্রামের প্রধান কথা অর্থনৈতিক লড়াই। "তাঁতী কর্মকার করে হাহাকার, সূতা-জাতী ঠেলে অন্ন মেলা ভার"—ইহাই পরাধীনতার আসল রূপ এবং এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিকার দাবীতেই মাত্র জাতীয়তাবাদে গণ-রূপ প্রকাশ হইতে পারে। নীলকর আন্দোলনেও মুখ্য ছিল চাষীর উপর আর্থিক শোষণের অবসান দাবী, আর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয়তাবাদী বঙ্গ-বিপ্লব পরিণত হয় স্বদেশী প্রচারের আন্দোলনে। বিলাতী বর্জন, দেশী শিল্প পত্তন ও দেশের কারিগরের অন্ন সংস্থানের চেষ্টার জন্য এই আন্দোলন দেশব্যাপী দাবানলের মতো বৈপ্লবিক আকারে বিস্তার লাভ করে। "দেশের পয়সা দেশেতে রাখ"—ইহাই ছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের আওয়াজ। দেশে শিল্প গড়িবার ও দেশী শিল্পকে বাঁচাইয়া দেশের কারিগর মজুর ও শিল্পীর অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন ও এমন কি সূক্ষ্ম রুচি পর্যন্ত পরিবর্তন করিবার

ডাক দিয়াছে জাতীয়তাবাদী বাংলা। বাংলার চারণ গায়ক *পল্লীতে পল্লীতে গাহিয়া ফিরিয়াছেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" আর সেই সাথে বাঙালী সন্তানের প্রতিজ্ঞায় রূপ দিয়াছেন কবি—"আমি পরের ধনে পড়ব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"

দিকে দিকে নিত্য নূতন শিল্প পত্তন ছাড়াও বঙ্গ-বিপ্লবে আর একটা মূলগত অর্থনৈতিক দিকে জাগরণের ডাক ছিল। তাহা বাংলায় জমিদারী উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে কৃষক প্রজার সজাগ হইবার ডাক। সংগ্রামের এই আসল দিকটা নেতৃত্বের নিরূপিত কর্মপন্থায় ছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী বিপ্লবে অর্থ জোগাইয়াছেন দেশের কতিপয় স্মরণীয় দানবীর জমিদার, যেমন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা শশীকান্ত আচার্য প্রভৃতি। তাহাছাড়া চারিদিকের স্বদেশী ভাব বন্যায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষায় অগ্রসর হইবার জন্য বৈপ্লবিক অভিযানে এবং ছোট বড় শিল্প কারখানা পত্তনে জমিদারের দান ও সহযোগিতা ছিল বড় সহায়। বোধ হয় সেই কারণেই রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কগণ সারা ভারতময় ভূমি ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পত্তন করার সুপারিশও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের বন্যা যখন আসে তখন বাঁধাধরা নেতৃত্বের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাঁধ উহা মানিতে অস্বীকার করে। গণ-বিপ্লব তখন আপনার সঙ্গত ও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়। প্রজার দুর্দশা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জমিদারী ব্যবস্থার অসঙ্গতি জন-সাধারণের চোখে স্পষ্ট হইয়া পড়ে। এই অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছে জনসাধারণ এবং সেই প্রশ্ন বাণী পাইয়াছে মুকুন্দ দাসের ও অনুরূপ শত সহস্র স্বদেশী-যাত্রা পল্লীগীতি ও

---

* গানটি রচনা রজনীকান্ত সেনের। কিন্তু ইহা বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার করেন স্বাধীনতার অমর পূজারী লোক-নাট্য-গীতি সম্রাট মুকুন্দ দাস।

ছড়ার ভিতর দিয়া। এই কারণেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ-বিপ্লব এত শক্তিশালী ও এত ব্যাপক হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক দিকে সহজ এবং স্পষ্ট দাবী ও পরিকল্পনা না থাকায় গত ২৫।৩০ বৎসরের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম গণ-সংযোগহীন উপরতলার ব্যাপারে পরিণত ও ফলে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় স্বরাজ দাবী করা হইয়াছে, কিন্তু স্বরাজের ব্যাখ্যায় যত আধ্যাত্মিক বুলি কচ্‌কচানি হইয়াছে তাহার এক আনাও হয় নাই গ্রামের নিরন্ন কৃষক ও বস্তির নরক-প্রায়-গৃহ-বাসী কুলীর চোখে স্পষ্ট করিয়া স্বরাজের বাস্তব রূপ দেওয়া। স্বরাজের জন্য গণ-সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয় নাই এবং সংগ্রামে জনসাধারণের নিকট কর্মপন্থা উদ্ভাবনের আবেদন জানান হয় নাই। উপর হইতে 'মাননীয় নেতৃবৃন্দ' যে কর্মপন্থা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। নইলে সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া আপোষ রফার আয়োজন হইয়াছে ও শাসকের অত্যাচারের মুখে শত শত সংগ্রামী সৈনিককে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ফলে পরাজয়ের উপর পরাজয় বরণ করিয়া নানান অছিলায় আত্মপ্রতারণা করা হয় বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জাতীয়তাবাদ পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া চলে; এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকের স্বদেশী চরের খপ্পরে পড়িয়া আত্মকলহের বিদ্বেষ বহ্নিতে জাতি প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলে।

সাদা-কালা সাহেবে পরামর্শ করিয়া দপ্তরখানায় সৃষ্টি যে স্বাধীনতা, জনসাধারণের তাহাতে উৎসাহ নাই। জাতির অর্থনৈতিক জীবনের বিপর্যয়ে সে অসহায়—প্রতিকারে অক্ষম দর্শক মাত্র। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব ও রুজিহীন দুর্বহ জীবনে সে মুক্ত দেখে আত্মকলহে ধ্বংসের পথ। আজ তাই গণমঙ্গলে উদাসীন, গণনেতৃত্বে আস্থাহীন, স্থিত-

স্বার্থরক্ষক নেতৃত্বের অন্ধ অনুসরণে বাঙালী জাতি মৃত্যুপথযাত্রী। হিংস্র বাঘিনী-গৃধিনীতে তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবন, ভাষা-সাহিত্য ও দর্শন ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, আর আত্মবিরোধের হানাহানির মধ্যে প্রেতের ডাকে পৈশাচিক উল্লাসে জাতি শবযাত্রা করিয়াছে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে জনসাধারণ শান্ত ও স্থির থাকিয়া সঙ্গত আচরণ করিতে পারে না। তাহার দাবী যদি গণ-নেতৃত্বে ভাষা না পায় তবে দিশেহারা হইয়া সে আত্মকলহে নিমজ্জিত হইতে বাধ্য। কারণ পেটে তাহার ক্ষুধার জ্বালা, আর মাথায় তাহার অন্ন সংস্থানের অক্ষমতায় অপমানের বোঝা। আত্মহত্যাই তাহার একমাত্র প্রশস্ত পথ। 'আনন্দমঠে' অগ্নি-ঋষি এই সম্ভাবনাই দেখাইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় নবকঙ্কালেরা কারাকারির আত্মবিবাদে ধ্বংসের পথ-যাত্রী। তাহাদের সাধারণ শত্রু অপদার্থ অকর্মণ্য অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তাহারা সংঘবদ্ধ হয় নাই। তাই করিয়াছে আত্মকলহ। কিন্তু যখন 'সন্তান'-সঙ্ঘ সংগঠিত হইল এবং এই সব বুভুক্ষুর দাবীতে ভাষা দিয়া সংগ্রাম ঘোষণা করিল তখন আত্মবিবাদ, কারাকারি ও উচ্ছৃঙ্খলতা কমিতে লাগিল।

'বন্দেমাতরম্' ও 'আনন্দমঠের' এই গণসংযোগের দিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় বাংলার জাতীয়তাবাদ এক কালে ভুল ও ব্যর্থপথে অগ্রসর হয় সন্ত্রাসবাদের মধ্যে। 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্তানে'র উত্থানের মৌলিক তত্ত্ব সম্যক অবধান না করায় গণ-সংযোগহীন ও জনগণে-অবিশ্বাসী গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথে বাংলার সংগ্রামশক্তির অপব্যয় হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদ জাতীয় জীবনে আত্মবিরোধ ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ায় নাই। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীত ও গণ-প্রতিষ্ঠায় অবিশ্বাসী নেতৃত্ব গত ২৫ বৎসর ধরিয়া

শোষকের সহিত আপোষ-রফার ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণে বাংলার বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের অপঘাত মৃত্যু ঘটাইতেছে। এই মৃত্যু হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করাই আজ প্রকৃত দেশসেবা।

গণনেতৃত্বে বিশ্বাসহীন আধ্যাত্মিকতাব হাতে জাতীয়তাবাদেব এই বিপদেব সম্ভাবনা বাংলার বিদ্রোহী কবিকে শঙ্কিত করিয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রাম আপন গতিতে চলাব পথে সর্বহারার দল উহাব মধ্যে হাত মিলাইয়া স্থিতস্বার্থের আধিপত্য যখন অস্বীকাব করিবে তখনকাব বিচলিত নেতৃত্বকে সাবধান করিয়া বিদ্রোহী কবি গাহিয়াছেন—

"তিমির রাত্রি—মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান,
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান,
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।"

বাঙালী কবির এ সতর্কবাণী উপেক্ষা করায় জাতীয়তাবাদ আজ ধ্বংসোন্মুখ। গণনেতৃত্বের পথেই মাত্র বাংলার জাতীয়তাবাদেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

(৬)

অর্থনৈতিক জীবনে বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অবিভাজ্য এলাকা। জাতির অর্থনৈতিক জীবন বলিতে বুঝায় (ক) কৃষি, (খ) শিল্প, (গ) উৎপন্ন পণ্যেব বাণিজ্যের এলাকা বা বাজার এবং (ঘ) সংযোগ ব্যবস্থা।

কৃষির প্রযোজন হাল-বলদ ইত্যাদি সরঞ্জাম আর নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত জমি। এই হিসাবে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, গারোপাহাড়, সুরমা উপত্যকা, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভুম, সিংহভুম, ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর সমেত সারা বাংলাদেশ স্বয়ং-

সম্পূর্ণ একটা অর্থনৈতিক এলাকা (unit)। সরঞ্জামের মধ্যে লোহা, বাঁশ ও কাঠ এই দেশে উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা ছাড়া ফসলের মধ্যে প্রয়োজনীয় ধান, অল্প পরিমাণ গম, পাট, ইক্ষু, তুলা, ডাল-কলাই ও রাই সরিষা ইত্যাদি রবিশস্য, চা, তৈলবীজ, জ্বালানী ও গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত কাঠ, যাবতীয় সব্জী, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি ফল, সুপারী ও নারিকেল পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদনের মতো প্রয়োজনীয় বিবিধপ্রকারের জমি এই এলাকাতে আছে। মৎস্য চাষ, ডিম-মাংস যোগান দেওয়ার মতো মুরগী, মেষ-ছাগল, শূকর ও গো-মহিষ ইত্যাদি পশু পালন এবং দুধ ঘি উৎপাদনের জন্য গো-মহিষ পালন কৃষির মধ্যে ধরা হয়। ইহা ছাড়া ভেষজ জাতীয় গাছপালা (তাহার মধ্যে সবপ্রধান সিঙ্কোনা), রেশম, পশম ইত্যাদি উৎপাদনও কৃষি-শ্রেণীভুক্ত। বাংলাদেশে এ সমস্তই পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু এই এলাকার কোন অংশ বাদ দিলেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর থাকে না এবং সেই বিচ্ছেদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিক ও নির্ভরশীল করিয়া ফেলে।

শিল্পের জন্য দরকার (১) শ্রম, (২) মূলধন, (৩) শিল্প-সংযোজনা বা ব্যবসায়-কুশলতা, (৪) খনিজ লভ্য কাঁচা মাল, (৫) কৃষিতে উৎপন্ন কাঁচামাল ও (৬) যন্ত্রচালনার উপযুক্ত প্রাকৃতিক শক্তি বা 'আদি শক্তি' (motive power), যেমন কয়লা, পেট্রোল অথবা জলস্রোত। এই বিবেচনাতেও বাঙালী অধ্যুষিত বঙ্গদেশ এক, অবিভাজ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কার্য-কারণ যোগে ভাগীরথীর উভয় তীরে যে সকল শিল্প কারখানা পত্তন হওয়ায় কলিকাতা ও সহরতলী বাংলার শিল্পাঞ্চল ও গৌরবের সম্পদে পরিণত হইয়াছে তাহার শ্রম সরবরাহ হইয়াছে প্রথম দিকে বিহার হইতে এবং বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে। এই সকল শিল্পের সওদাগরী আফিসে চাকরী করে বেশীর ভাগ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এবং তাহারাই গত কয়েক বৎসরে কলিকাতা ও সহরতলীর

জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে অভাবনীয় রূপে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-সম্পন্ন শ্রম সরবরাহ পূর্ববঙ্গ ব্যতিরেকে বাংলাদেশ হইতে সম্ভব নহে। কারখানার নিম্নপদের মজুর-গিরিতে যখন পূর্ববঙ্গবাসী আসে নাই তখন মজুর সরবরাহ হইয়াছে বিহার হইতে। কিন্তু আজ বিহারী মজুরের সহিত প্রতিযোগিতায় পূর্ববঙ্গ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকেরা আঁটিয়া উঠিতে পারে না। পূর্ববঙ্গের সমস্ত কারখানায় মজুরী করে হিন্দু-মুসলমান পূর্ববঙ্গবাসী, আর পশ্চিমবঙ্গের কারখানাতেও আজ অধিকাংশ মজুর আসিতেছে পূর্ববঙ্গ হইতে—যেমন বাটা কোম্পানী ও সহরতলীর কাপড়ের কলগুলিতে। শ্রম সরবরাহে বঙ্গ-বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ পর-নির্ভরশীল। দক্ষ শ্রমিকের তো ষোল আনাই পূর্ববঙ্গবাসী বলা চলে।

বাংলার শিল্প প্রচেষ্টায় মূলধন জোগাইয়াছে ইংরেজ, মাড়োয়ারী ও পূর্ববঙ্গবাসী। মূলধন সরবরাহে পশ্চিমবঙ্গ আত্মপ্রতিষ্ঠ নহে। বাঙালী শিল্পপতিদের যে কয়েকটা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, তাহা প্রায় সবগুলিই পূর্ববঙ্গবাসীর পরিচালিত। মূলধন সরবরাহের প্রধান যন্ত্র ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান। বাঙালী মূলধনে যে সকল ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে তাহার পনর আনাই পূর্ববঙ্গবাসীর। ইহা ছাড়া বাঙালীর নিজস্ব ছোটখাট যত শিল্প কারখানা আছে তাহার অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের। বঙ্গ-বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ মূলধন সরবরাহে সম্পূর্ণ পঙ্গু।

শিল্প-সংযোজনা ক্ষেত্রেও একই কথা। বাঙালী পরিচালিত যে সকল শিল্প কারখানা বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশেরই ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা সরবরাহ করিয়াছে পূর্ববঙ্গবাসী। ইংরেজ ও মাড়োয়ারীর সহিত পাল্লা দিতে সাহসী হইয়াছে একমাত্র পূর্ববঙ্গবাসী। বঙ্গভঙ্গে বাংলার শিল্প-সম্পদ সম্পূর্ণভাবে অবাঙালী পুঁজিপতির হাতে চলিয়া যাইবে। কারণ পূর্ববঙ্গবাসী হইবে 'পরদেশী' আর মাড়োয়ারী হইবে 'স্ব-দেশী'—হিন্দুস্থানের নাগরিক।

খনিজলভ্য কাঁচামাল সম্পূর্ণই পশ্চিমবঙ্গের অধীন। বঙ্গভঙ্গে পূর্ববঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল কিন্তু যুক্তবঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কৃষিতে উৎপন্ন কাঁচামালে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরে নির্ভরশীল এবং যুক্তভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পূর্ববাংলার পাট দরকার পশ্চিমবাংলার চটকলে, আর পশ্চিমবঙ্গের (পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার) রাই সরিষা দরকার পূর্ববাংলার দৈনন্দিন প্রয়োজনে। নারিকেল সুপারীর আবাদ একমাত্র পূর্ববঙ্গেই বলা চলে। ধানের প্রাচুর্য পূর্ববঙ্গে আর গম জন্মে বিহার-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে। কার্পাস তূলার চাষ সম্ভব ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চল, গারো পাহাড়ের সানুদেশ, গোয়ালপাড়া ও সুরমা উপত্যকায় পর্যাপ্ত; আর ইক্ষুর চাষ উত্তরবঙ্গে ও বিহার-সংলগ্ন বাঙালী অঞ্চলে।

মূলশক্তি (motive power) প্রজনন বিষয়ে বাংলাদেশ পরস্পরে নির্ভরশীল। কয়লা একচেটিয়া পশ্চিমবঙ্গের (জলপাইগুড়ি জেলার বাগরাকোট অঞ্চল সমেত)। পেট্রোল বাংলার কোথাও নাই। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড অঞ্চলে খনিজ সম্পদ কিছু থাকিলেও তাহা নিরূপিত হয় নাই। শ্রীহট্টে কয়লা আছে কিনা অনুমানের বিষয়। জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ প্রজননেও বিভক্ত বঙ্গ পরনির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গ নির্ভর করে দামোদরের উৎপত্তি-ভূমি ছোটনাগপুরের উপর। ময়ূরাক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যৎসামান্য আয়োজন সম্ভব। পূর্ববঙ্গ এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই পরনির্ভরশীল। তিস্তা নদীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাব্যতা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সহায়তার উপর নির্ভর করে। কর্ণফুলী, গোমতী, ডাকাতীয়া, সুরমা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর জলরাশি হইতে বিদ্যুৎ প্রজনন করিতে হইলে উহাদের উৎপত্তিস্থল পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরারাজ্য, কাছাড় এবং খাসিয়া ও লুসাই পাহাড়ের সহযোগিতা দরকার। ব্রহ্মপুত্রের জলধারার সদ্ব্যবহার করিতে হইলে

গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড়ের অমুসলমান অঞ্চলের সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। গারো ও খাসিয়া পাহাড় হইতে যে সকল নদী-নালা নির্গত হইয়া পূর্ববঙ্গে বন্যার সৃষ্টি করে সেগুলি সংযত করিয়া বন্যা নিবারণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব কেবল সাম্প্রদায়িক-বিচ্ছেদশূন্য সংযুক্ত বঙ্গে। পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ ব্যতীত এই সকল বিপুল শক্তিরাশি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অপদার্থ আত্মঘাতী বাঙালী জাতিকে ধিক্কার দিতে দিতে মহাসাগরে বিলীন হইতে থাকিবে। কারণ, উৎপত্তিস্থল হিন্দু-বঙ্গ আর ফলভোগ করিবে স্বতন্ত্র মুসলমান-বঙ্গ, বিবদমান জাতির পক্ষে এ অসহ্য। প্রকৃতির দানের এই ক্ষমাহীন অপচয়ে আত্মকলহমান জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

স্বতন্ত্র পূর্ববঙ্গের কেহ কেহ আশা করেন, তাঁহারা পদ্মার জলধারা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবেন। তাঁহারা মনে করেন, সারা পুলের নীচে পদ্মার যে স্রোতোবেগ তাহা হইতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু তাঁহারা জানেন না বঙ্গদেশে পদ্মার গতি-প্রকৃতি। সারা ব্রিজের নিকটে ভূমির উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে এক শ' ফুটের কম এবং পদ্মার খাত উভয় পার্শ্বের ২।৩ মাইল দূরবর্তী ভূমি হইতেও উচ্চতর। এ হেন সমতলক্ষেত্রে নদী হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা স্বপ্নবিলাস মাত্র। অন্তত খরচ পোষাইবে না। তাহাছাড়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াই পদ্মানদী অন্তঃসলিলা হইয়া পড়িয়াছে। সম্বৎসরে অর্ধেকের বেশী জলরাশি বালির তলা দিয়া বহিয়া যায় বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন। পদ্মায় বাঁধ দিবার (Barrage) যে পরিকল্পনা গত বৎসর বাংলা সরকার প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও পূর্ত ও জলনিকাশ-ব্যবস্থা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা করা হয় নাই।

কৃষি ও শিল্পে যাহারা পরস্পর নির্ভরশীল বাণিজ্যেও তাহারা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত। পশ্চিমের শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যের বাজার পূর্বের

কৃষি-প্রধান ও জনবহুল অঞ্চলে। পূর্ববাংলার লোকেরা শিল্পাঞ্চলে শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করিয়া ঘরে লইয়া গেলেও এই শিল্পে উৎপন্ন পণ্য দেশে ক্রয় করিয়া সে পয়সা ফিরাইয়া দেয়। কলিকাতার পণ্য আজ তাই পূর্ববঙ্গমুখী। কলিকাতা বন্দর হইতে রেলে ও ষ্টীমারে যে সকল মাল রপ্তানী হয় তাহার অধিকাংশ পূর্ববঙ্গে। ইহার পরিচয় মেলে বড়বাজারে। মাড়োয়ারী ও অবাঙালী ছাড়া বড়বাজারে যে কয়জন বাঙালী ব্যবসায়ী আছে তাহাদের প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গবাসী। বিভক্ত বঙ্গে কলিকাতার বাণিজ্যের সর্বনাশ হইবে। পূর্ববঙ্গের বাজার কলিকাতার হাতছাড়া হইলে চট্টগ্রামের পথে বিদেশী পণ্যে পূর্ব-বাংলা ছাইয়া ফেলিবে এবং সমগ্রভাবে বাঙালীর শিল্পের ও আর্থিক জীবনের সর্বনাশ সাধন করিবে।

বাণিজ্যের সহিত জড়িত গমনাগমনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর কৃষির সহিত সেচ্ ব্যবস্থা। সংযোগ ব্যবস্থা প্রধানত দুই ধরণের— জলপথে ও স্থলপথে। জলপথে সংযোগ ব্যবস্থার সহিত সেচ্ জড়িত। সেচ্ ও জলপথ পরিকল্পনার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন বাংলার নদীগুলির সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন। এই কার্য নদীর উৎপত্তি-স্থল, প্রবাহপথ ও পরিণতি-স্থলের পরস্পর সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। বঙ্গদেশে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই মূল নদী ব্যতীত আর সকল নদীগুলিরই উৎপত্তি, প্রবাহ ও পরিণতি বাঙালীর অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই হিসাবে নদীমাতৃক বাংলাদেশ সৌভাগ্যশালী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্তাবিশিষ্ট। দামোদর নদের উৎপত্তি ছোটনাগপুর পাহাড়ে। উহাও বৃহৎবঙ্গ পরিবার-ভুক্ত। কিন্তু নদ-নদী পরিকল্পনার পথে বাংলাদেশের কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় বিভাগ অস্বাভাবিক ও জাতীয় জীবনের সর্বনাশকর। বাঙালী জাতির সুস্থ বিকাশের পথে এই বিভাগ চরম অন্তরায়। মহানন্দা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রাই, করতোয়া, তিস্তা ও

জলঢাকা নদীগুলি উত্তরবঙ্গের প্রাণস্বরূপ, এবং এইগুলির সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন ব্যতীত উত্তরবঙ্গের আর্থিক জীবনে উন্নতি ও অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই সমস্ত নদীগুলির উৎপত্তি-স্থল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায়, আর প্রবাহ ও পরিণতি দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলায়—অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিভাগে মুসলমান-অঞ্চলে। বঙ্গ-বিভাগে এই কারণে এই নদীগুলির সংস্কার ও উদ্ধার সম্ভব হইবে না। অথচ এই বিরাট কার্যে অবহেলায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের আর্থিক জীবন ও স্বাস্থ্য-সম্পদ ধ্বংসের পথে।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলির প্রবাহ নিশ্চিত না হইলে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা সম্পর্কেও কোন সঙ্গত নীতি গ্রহণ সম্ভব নয়। মৈমনসিংহ জেলার ছোট ছোট নদীগুলির উৎপত্তি গারোপাহাড় হইতে। আর মেঘনা, ডাকাতিয়া, সুরমা, গোমতী, কর্ণফুলী প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি অমুসলমান অঞ্চলে, কিন্তু প্রবাহ মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে। সেইজন্য সহযোগিতার অভাবে বৈদ্যুতিক পরিকল্পনার মতো সেচ ও জলপথেরও কোন বিজ্ঞান-সম্মত সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। দক্ষিণ বঙ্গের ভাগীরথী, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, চুর্ণী, কুমার, গড়াই, (মধুমতী) প্রভৃতি নদীগুলি উদ্ধার না করিলে বাংলার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি ও প্রবাহপথে খণ্ডিত বঙ্গের সীমান্ত-বিরোধ এদিকে উন্নতির সকল আশা নির্মূল করিবে। তাহাছাড়া উত্তরবঙ্গে পদ্মা ও যমুনার উপনদীগুলি সম্পর্কে কোন সঙ্গত নীতি গ্রহণ করিতে না পারিলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের শাখানদীগুলিরও সঙ্গত ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কাজেই বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, সীতালাক্ষা, আড়িয়াল-খাঁ ও মেঘনা সম্পর্কেও কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলিবে না। এইভাবে বঙ্গ-বিভাগে 'স্বাধীন' রাষ্ট্রগুলি যে-তিমিরে সে-তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

স্থলপথ নির্মাণেও বিভক্ত বঙ্গে পর্বত প্রমাণ বাধা। পূর্ত ও সেচ সম্বন্ধে সুস্থ নীতির অভাবে খাপছাড়া অবৈজ্ঞানিক ধারায় স্থলপথ নির্মাণে বাংলার ধ্বংস ত্বরান্বিত করিবে।

জলপথে সুদক্ষ ও পরিশ্রমী নাবিক সংগ্রহে বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জের লস্কর বাংলার গৌরব। তাহাদিগকে বাদ দিয়া বাংলার জাহাজ ও ষ্টীমার অচল, কলিকাতার ডক্ জনহীন। আজ বিশেষত পশ্চিম বাংলার সমস্ত খেয়াঘাট অবাঙালীর দখলে। ভাগীরথীর বুকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর নৌকা একখানাও দৃষ্টিগোচর হয় না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে পশ্চিমবঙ্গকে জাহাজী নাবিকের জন্য মদ্রদেশের দ্বারপ্রার্থী হইতে হইবে। আর পূর্ববঙ্গের লস্করেরা বেকার জীবনে আত্মকলহ বাড়াইবে।

বাংলার অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার বিরুদ্ধে মতলববাজের মুখে এক অদ্ভুত যুক্তি শুনা যায়। বলা হয়, সরকারী বাজেট বরাদ্দে বঙ্গদেশে চিরকাল ঘাটতি পড়ে এবং সেজন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরখানায় বাংলাকে বরাবর দরবার করিতে হয়। অতএব বাংলার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইত্যাদি। এই যুক্তি ঘাটতি বাজেটের মূল সত্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখিয়া বিভ্রান্ত করিবার ফন্দি। ঘাটতি বাজেটের আসল কারণ, সরকার বড়লোকের ঘাড়ে ন্যায্য করভার চাপাইতে সাহসী বা ইচ্ছুক নহে। যাহাদের নিকট ঋণ লইয়া ঘাটতি পূরণ করা হয় তাহাদের উপর করভার চাপাইলেই ঘাটতি হয় না। তাহাছাড়া ব্যয় কমাইলেও বাজেটের ঘাটতি বন্ধ করা চলে। কিন্তু বাজেটে ঘাটতি বন্ধ করিবার জন্যই ব্যয় হ্রাস করা আধুনিক যুগে কোন সরকারের আদর্শ হইতে পারে না, এবং ঘাটতি বাজেট অপেক্ষা বাড়্তি বাজেট কোন দিনই কৌলিন্য দাবী করিতে পারে না। বরং বাড়্তি বাজেটে জনকল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণে অপদার্থ সরকারের

অক্ষমতাই প্রকাশ হয়। বাজেট বরাদ্দে দেখিবার আসলে দুইটি বিষয়। প্রথমত, ব্যয় বরাদ্দগুলি সমীচিন কিনা, অর্থাৎ উহাতে জনকল্যাণের পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং দ্বিতীয়ত, করভার কাহার উপর চাপান হইতেছে—গরীবের উপর না ধনীর উপর, অথবা কর-ব্যবস্থায় শিল্পজগতে বিপর্যয় আশঙ্কা করা যায় কি-না। বাজেট ঘাটতি কি বাড়তি, ইহা খুব বড় কথা নয়। বাড়্তি বাজেট সর্বথা নিন্দনীয়।

কেন্দ্রীয় দপ্তরে বাংলাদেশ যে ধর্ণা দেয় তাহার কারণ বাংলার কোনরূপ আর্থিক দুর্বলতা বা দৈন্য নহে। তাহার মূল কারণ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের এক অস্বাভাবিক রাজস্ব-বিলিব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনে স্যার অটো নিমেযারের এক অসঙ্গত ফতোয়া, যাহার জন্য গত দশ বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশ কেন্দ্রের নিকট অবিচারই পাইয়া আসিয়াছে।

বাংলাদেশের অবিভক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকৃতির ন্যায়বিধান। গঙ্গার সঙ্কীর্ণ প্রবাহ পথ ব্যতীত চতুর্দিকে পর্বত, মালভূমি ও সমুদ্র বেষ্টিত এই দেশের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে ঐক্যবদ্ধ স্বতন্ত্র সত্তা নিরূপিত হইয়াই আছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের মোহে বিশ্ব-বিধানের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে আত্মনাশ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলার এক মনীষী বাংলার নদীনালার প্রতি অযত্ন ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অবহেলায় আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতির গৌরবছটা মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ ছড়াইয়াছে সেই জাতি বুঝি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই অস্তরবির শেষ রক্তরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া পশ্চিম গগনে বিলুপ্ত হয়। আজিকার আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ না করিলে এ আশঙ্কা সম্ভব সত্য হইবে।

(৭)

ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালী এক ও স্বতন্ত্র। বাংলার স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার স্বতন্ত্র জাতীয়তায়। এই জাতীয়তা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাহার লোক-সাহিত্যে। বাংলার পল্লীগীতি বাঙালীকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমানের সামগ্রিক বাঙালী জাতীয়তা বিকাশ করিয়াছে। এ সাহিত্য হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়,—বাঙালীর। বাংলার পল্লীকবির কাছে দুর্গা হইয়াছে মাঠে ধান কুড়ানী ও ডোবার ধারে মাছধরা জেলেনী এবং ঘরে বার-মুখো স্বামীর সাথে কোন্দলরতা, সন্তান পালিনী জননী। বাংলার শিব হইয়াছে আত্মভোলা ও গরীবের ঘরে পত্নীর উপরে একান্ত নির্ভরশীল গৃহী। বাঙালী কবির কাছে সীতা হইয়াছে লাঞ্ছিতা চিরদুখিনী বালিকা, আর তাহার নামে বাঙালী-মনের সকল স্তরে করুণ রসে ভরপুর হইয়া যায়। বাংলার চাঁদ সওদাগর সপ্তডিঙ্গি ভাসাইয়া বাণিজ্যে যায়, আর বিধির অভিশাপে সপ্তডিঙ্গি ডুবিলে বাঙালীর কোমল প্রাণ সেই সপ্তডিঙ্গি উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। গোপালকে সঙ্গে লইয়া রাখালেরা যায় ধেনু চড়াইতে আর বাঙালী জননী সারাদিন পথপানে চাহিয়া থাকে আকুল প্রতীক্ষায় খাবার হাতে লইয়া। বিলম্ব হইলে যশোমতী উতলা হইয়া ওঠে, এবং পরদিন কিছুতেই জননী তাহার সন্তানকে চোখের আড়াল করিবে না। মা তাই বলিয়া দেয়—"তোমরা সবে যাও গো গোষ্ঠে, আজ আমার গোপাল দিব না।" অবাধ্য সন্তানকে শিক্ষা দিবার জন্য জননী গোপালকে বাঁধিয়া রাখে আর সেই বাঁধনের চাপে গোপালের 'সোণার অঙ্গ' কালো হইয়া যায়। তখন বাংলার কবি অভিযোগ করে, "হে মা, মিছে মায়া তোর—"। ইহারা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, কোন ধর্ম-সম্প্রদায়েরই নয়। ইহারা বাঙালী—বাংলার কবির মানসসৃষ্ট।

সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর গল্পে বাঙালী নীতি শিক্ষা লয়, রূপকথার কাল্পনিক জগতে অতীন্দ্রিয় রসাস্বাদন করে, আর বাঙালী ছেলের দল ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়িয়া বাহির হয় রাজকন্যার দেশে একক অভিযানে। বাঙালী গাজী-বদর পাঁচপীডের নাম লইয়া যাত্রা সুরু করে, চাঁদ কাজীর পদাবলীতে আত্মহারা হয়, ফুল্লরা-কালকেতু ব্যাধের সুখ-দুঃখ নিজের জীবনের সহিত মিলাইয়া লয়, ময়নামতীর সাথে অশ্রু বিসর্জন করে আর কমলের কামিনীকে দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা পাইতে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

বাঙালী সাপ পূজা করে, শেয়াল-বাঘও পূজা করে, কুমীর পূজা করে, ষাট্-ষষ্ঠী পূজা করে, গোঁসাই পাঁচড়ার দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখে, আর বাশের জন্মবার বিষ্যৎবারে ঝাড়ে কোপ দেয় না। আবার সেই বাঙালীই গব করে—

"বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় সাপেরে খেলাই, নাগের মাথায় নাচি।"

এই সংস্কার-ভালবাসা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও স্নেহ-প্রীতি লইয়া বাঙালীর জাতীয় জীবন, জাতীয় সাহিত্য বা লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার—যাহা এখনও পরিমাপ করা হয় নাই। আবেক্ষণের অভাবে সে ভাণ্ডার আজ শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। বাংলার এই লোক-সাহিত্যের বিরাট রূপ বাঙালীর চোখে ধরা পড়ে নাই। এত বড় সম্পদ এশিয়ার অন্য কোন জাতির আছে কিনা সন্দেহ। এ সাহিত্য নীচ-স্তরের ইতর শ্রেণীর সাহিত্য নয়। ইহা খাঁটি জাতীয়-সাহিত্য এবং বাঙালীর সাহিত্য। এই সাহিত্য সাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে এবং নিরক্ষর বাঙালী চাষীকে নীতিধর্ম শিখাইয়াছে ও সাহিত্যের অতীন্দ্রিয়

রসাস্বাদন করাইয়াছে। এই সাহিত্য বাঙালী-বীরের মাথায় গৌরব-মুকুট পরাইয়া রূপকথার নায়কের দলে ফেলিয়াছে। বাংলার ক্ষুদিরামকে বাঙালীর লোক-সাহিত্য সেই আসন দিয়াছে।

বাংলার লোক-সাহিত্যে কোনরূপ শ্রেণীগত স্বার্থদ্বন্দ্বের বিচ্ছেদ আসিতে পারে না এবং এই সাহিত্যের অধিকারী বাঙালী বিভক্ত হইতে পারে না। ইহার পশ্চাতে আছে বাংলার সাবলীল ইতিহাস —বাঙালীর গৌরবময় ঐতিহ্য। মোহনলাল-মীরমদন, আলীবর্দী-সিরাজ, প্রতাপাদিত্য-কেদার রায়, ঈশা খাঁ-হুসেন সাহ্‌ ও পাল রাজগণের স্বাধীন ঐতিহ্যে রচিত বাংলার এই বিরাট লোক-সাহিত্য।

লোক-সাহিত্যের পরে আসে বাংলার আধুনিক সাহিত্য যাহা লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাহিত্য আজ বাংলার হিন্দু-মুসলমানের গৌরবের সম্পদ। এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাণবান ও বলিষ্ঠ এই সাহিত্য। ইহা বাংলার আধুনিক ইতিহাসকে রূপ দিয়াছে ও বাংলার প্রাচীন ইতিহাসকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছে। ইহার বাহন বঙ্গভাষা বাঙালীর আত্মার বন্ধন দৃঢ় করিয়াছে ও বাঙালী জাতিকে এক অবিভাজ্য পরিবারে পরিণত করিয়াছে।

বাংলার আধুনিক সাহিত্যে দান বাঙালী হিন্দুর চাইতে মুসলমানের কম নহে, বরং বেশী। বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়াছেন মুসলমান নরপতিগণ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি বাংলাভাষায় চর্চা সম্ভব হইয়াছে মুসলমানের সাহায্যে। বিদ্যাপতি উৎসাহ পাইয়াছেন মুসলমান নবাবের কাছে। বাংলা মহাভারতের সাথে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে বাংলার নাজির শাহ্, পরাগল খাঁ, ছোটে খাঁ ও হুসেন শাহ্‌র নাম।*

* "The first Bengali rendering of the Mahabharat was ordered by Nazir Shah of Bengal who was a great patron of the Vernacular of the Province and

ভাষা ও সাহিত্যে যেখানে ঐক্য, নৃতত্ত্বের বিচারে জাতের বা গোষ্ঠীর ঐক্যও সেখানে নিশ্চিত। বাঙালী মিশ্র বা শঙ্কর জাতি। তাহার রক্তে প্রবাহিত বিভিন্ন জাতির প্রাণধারা বাঙালীর গৌরব। একই ধারার সংমিশ্রণে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান। তিব্বতীয, ব্রহ্মবাসী, মুণ্ডা, মুদ্দা ও সাঁওতালের রক্তসংমিশ্রণে এই জাতি কিনা সে বিচার করিবেন নৃতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা। কিন্তু বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান যে একই ধরণের রক্ত সংমিশ্রণে সৃষ্ট একই শঙ্কর জাতি যাহা তাহার প্রতিবেশী যে কোন জাতি হইতে স্বতন্ত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

whom the great poet Vidyapati has immortalised by dedicating to him one of his songs.........It is doubtful whether a Muslim Ruler of Bengal or the Hindu Raja Kans Narayan appointed Krittibas to translate the Ramayan into Bengali. Even if the latter story be true it is undoubted that Muslim precedents influenced the action of the Raja.........Emperor Husain shah was a great patron of Bengali. Haladhar Basu was appointed by him to translate the Bhagabat Puran into Bengali.........Paragal Khan, a general of Husain shah and Paragal's son Chhute Khan have made themselves immortal by associating their names with the Bengali translation of a portion of the Mahabharat"—N. N. Law—'Promotion of Learning in India during Mahommedan Rule'. [মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ হয় বাংলার নবাব নাজির সাহেব নির্দেশে। তাঁহার নামে একটি গান উৎসর্গ করিয়া মহাকবি বিদ্যাপতি বাংলাভাষার এই মহান পৃষ্ঠপোষককে অমর করিয়াছেন। কৃত্তিবাসকে রামায়ণ বঙ্গানুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন হিন্দু রাজা কংস নারায়ণ কিম্বা কোন মুসলমান শাসক, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে রাজা (কংস নারায়ণ) যে মুসলমানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্রাট হুসেন শাহ্ বাংলা সাহিত্যের সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনিই হলধর বসুকে ভাগবত পুরাণ অনুবাদ করিতে নিয়োগ করেন। সম্রাটের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছোটে খাঁ মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন।]

চারু শিল্পেও বাংলার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর স্থাপত্য শিল্প আর বারেন্দ্রভূমির ভাস্কর্য বাঙালীর এক স্বতন্ত্র সূত্রে জাতীয় জীবনে বিকাশের পরিচয় দেয়। বাংলার কুটীর শিল্পে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বঙ্গনারীর আলপনা পদ্ধতির মধ্যে বাঙালী জীবনের ঐক্যবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

(৮)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বড দুঃখে বলিয়াছিলেন, "বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।" বাঙালী ভুলিয়াছে তাহার অতীত, জলাঞ্জলি দিয়াছে সম্ভাব্যতাপূর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই বিস্মৃতির জন্য সে ভুলিয়াছে কে তাহার আপন আর কে তাহার পর। বাংলার স্বার্থ, বাংলার ঐতিহ্য ও বাংলার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলিয়া বাঙালী আজ উন্মত্ত-উল্লাসে শ্মশান-যাত্রী। কবে কি উদ্দেশ্যে পুরাণকার ছিন্নমস্তার কল্পনা করিয়াছিলেন জানা নাই। কিন্তু বাঙালী আজ ছিন্নমস্তা সাজিয়া আপন রুধির পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চারিদিকে পিশাচের দল খলখল হাসিতেছে আর উন্মাদ-অট্টাহাস্যে শ্মশান-শিবার ডাকে জাতি শবযাত্রা করিযাছে। এতবড আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত মানবের ইতিহাসে মেলা কঠিন।

পরাধীন জাতির বিকার বিশ্বপ্রেম। নিজের দেশের নাগরিকের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া সে স্বপ্ন দেখে বিশ্বের নাগরিকতার। নিজের দেশের গোলামী মোচনে অক্ষমতা লুকাইবার অছিলায় সে প্রচার করে বিশ্ব-রাজ্যের ব্যাপকতার কথা। নিজের দেশের আসন ভাঙিয়া সে বিশ্বসভায় আসন খোঁজে। তাহাতে গোলামী ঘোচে না। বিশ্ব-রাষ্ট্র-সভায় হাততালি মেলে—বাহবা পাওয়া যায় প্রচুর। কিন্তু নিজের দাবী বাস্তবে প্রতিষ্ঠা হয় না। পরমুহূর্তেই সেই বাহবা দারুণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের মতো নিজদেহে কষাঘাত করে। বিশ্বসভায় সম্মান

লাভের আত্মপ্রসাদ হীনবল পরাধীন জাতির আত্মপ্রতারণা। আজ বাঙালী জাতির সেই আত্মপ্রতারণার পর্যায় চলিতেছে। বাঙালী জাতীয়তা ভুলিয়া অখণ্ড-ভারতীয় রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠের বলিরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, আর বিশ্বরাষ্ট্র-দরবারের সম্মান লইয়া মাতামাতি করে। 'রাষ্ট্রভাষা' ও সাহিত্যে সে বাংলাকে ভুলিয়া ভারতীয় ঐক্য লইয়া ব্যস্ত। নিজের ঘরকে পরের করিয়া সে বিশ্ব-ঘরের মহাশূন্যে বাসা-বাঁধিবার স্বপ্নে বিভোর। সমাজের ঐক্যের দোহাই পাড়িয়া পারিবারিক বিচ্ছেদের যুক্তি যেমন হাস্যাস্পদ, তেমনি ভারতীয় ঐক্যের অজুহাতে বাংলার অনৈক্য মারাত্মক প্রমাদ। ইহাতে ভূমার সন্ধান নাই। আছে শুধু পরাজয়ের গ্লানি।

ভারতীয়তার নামে আজ বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে তুলিয়া ধরা হইল রক্তলোলুপ ব্যাঘ্র ভল্লুকের খপ্পরে। দুইটি পৃথক রাষ্ট্র ও পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মধ্যে বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার আয়োজন পাকা হইল! কার্জনের পরিকল্পনাও এত নিষ্ঠুর ছিল না। বাংলার আর্থিক জীবন, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাধীন আত্ম-প্রতিষ্ঠা ধূলিসাৎ করিয়া হিন্দী ও উর্দুর মাধ্যমে সর্বভারতীয় হলাহল পান করিবে বাঙালী জাতি। "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী।" 'আত্মবিস্মৃত জাতি' এতদিন ইংরেজীর গোলামী করিয়া আজ হিন্দী ও উর্দুর গোলামীতে আত্মবিলোপ করিতে উল্লাস-মুখর।

এই গোলামীর অবসান না ঘটাইলে বাঙালীর পিতৃপুরুষ স্বর্গ হইতে চিরকাল অশান্তিতে অভিশাপ দিবে। সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনী দত্ত ও দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ ও প্রফুল্লচন্দ্র, মহসীন ও বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথের আত্মা চিরকাল অপদার্থ বাঙালী জাতিকে ধিক্কার দিবে।

জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ

৩। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

প্রাচ্য সভ্যতার মহাকেন্দ্র ভারতবর্ষ চিরকাল ধরিয়া মানুষের মনে এক গভীর রহস্যের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। এই রহস্যাবৃত ভারতের আকর্ষণে দুর্বার গতিতে ছুটিয়া আসিয়াছে যুগ যুগান্ত ধরিয়া পৃথিবীর কত জাতির বিজয়ী সেনানী, কত ভক্ত জ্ঞান-প্রার্থী আর কত সওদাগর পুরস্কার-লোভী। কত ব্যক্তি সফল হইয়াছে, আর কত অজ্ঞাত উৎসাহী আকাঙ্ক্ষী বিফল হইয়া বিস্মৃতির তলায় বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। পৃথিবীতে আর কোন দেশের ইতিহাস এত প্রাচীন ও এত বৈচিত্র্য-পূর্ণ নয়। কোন দেশে বোধ হয় এত আক্রমণ, এত জয়-পরাজয়, ধ্বংস ও রক্তক্ষয় হয় নাই। আবার মানব ইতিহাসে কোন দেশেই বোধ হয় এত ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যেও এক অবিচলিত সত্তার অবিচ্ছিন্ন বিকাশের সত্যরূপও দেখা যায় নাই। উদ্বেল তরঙ্গাঘাতে সমুদ্রকূল ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, আবার উদ্বেল তরঙ্গমালাই সে ক্ষয় ভরিয়া দিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কবি তাই গাহিয়াছেন—

> "রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
> ভেদি মরুপথ, গিরি-পর্বত যারা এসেছিল সবে,
> তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর,
> আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।"

কি সেই ভারতবর্ষ যাহার আকর্ষণে যুগে যুগে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ছুটিয়া আসিয়াছে ইপ্সিতের সন্ধানে এই 'মহামানবের সাগরতীরে'? কি তাহার সত্য রূপ, কি তাহার সম্পদ যাহা হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের

মধ্যেও তাহার সামগ্রিক সত্তায় অবিচলিত স্থির গতিতে সত্ত্বের পথে, বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে? ইহা ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতা। কবি তাহার রূপ দিতে পারেন নাই—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হ'ল হারা।"

এই আহ্বান একদিকে ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের, যে ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ মানুষকে নিত্যকালে আলোকের পথ নির্দেশ করিয়াছে, আর অন্যদিকে ভারতভূমির আর্থিক সম্পদের—জীবন যাত্রার উপযোগী পর্যাপ্ত বস্তুগত-পরিবেশের, কবি যাহাকে বলিয়াছেন, "ফলবতী স্রোতস্বতী শতখনি-রত্নের নিধান।" যাহার টানেই আসুক, যে লোভেই বিজয়ী ভারতবর্ষ আক্রমণ করুক, ভারতবর্ষ পরাস্ত হয় নাই,—আক্রমণকারী বিজয়ীকে সে আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহাই যুগে যুগে ভারতের সত্যরূপ। এই সত্যরূপ কবির সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।—

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথী, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুন বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।

* * * * *

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।"

এই ভারতবর্ষকেই মানবজাতি 'জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী' বলিয়া জানিয়াছে, এবং ভাবুক কবি 'দেশবাসীর সাথে ঐক্যতানে ইহারই বন্দনা গাহিয়াছেন—

"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, জয় মা জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষ।"

ভারতবর্ষের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এ রূপ অতীন্দ্রিয় জগতের, স্থূলদৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নহে। ভাষার সীমায় ইহাকে বাঁধা যায় না। কবি তাই শুধু বাহ্যিক, প্রাকৃতিক রূপ—'নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণ-তল', 'অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল, শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী'—মাত্র বর্ণনা করিয়া তৃপ্তি পান নাই। পরক্ষণেই গাহিয়া উঠিয়াছেন, "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে," এবং তারপরেই তাহার কল্যাণমূর্তির পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই—

"চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্যপিযূষ-স্তন্য বাহিনী।"

ভারতবর্ষের বন্দনা করিতে গিয়া আর এক প্রেমিক কবি তেমনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। শীর্ষে শুভ্র হিমালয়, পদতলে জঙ্ঘা ঘেরিয়া সাগর-ঊর্মি, বক্ষে পঞ্চসিন্ধু গঙ্গা যমুনা, তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্য ও শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র মাত্র দেখিয়াই কবি আনন্দ পান নাই। তিনি পূর্ণানন্দ লাভ করিয়াছেন জননীর মাতৃরূপ ধ্যান করিয়া—

"জননী, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননী, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ,
জগৎপালিনী, জগত্তারিণী, জগজ্জননী ভারতবর্ষ!"

বাংলার এক অন্ধ প্রেম-সাধক একদিন অতীব বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প লইয়া প্রারম্ভ হইতে

শেষ পর্যন্ত শুধু 'মধুর,' 'মধুব' ভিন্ন আর কোন বর্ণনা দিতে পারেন নাই।* বাংলাব মাতৃসাধক কবি তেমনি ভাবে ভারতবর্ষের অনাদিগভীর রূপের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। কেবল মাঝে মাঝে 'পবিত্র ধরিত্রী' আব 'তীর্থক্ষেত্র' ছাড়া ভাবাবিষ্ট সাধকেব ভাষায় আর কিছু প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় নাই।

"ধ্যান গম্ভীব ওই যে ভূধব,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হোথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীবে—
এই ভাবতের মহামানবের সাগরতীরে।"

সেই সুরেই ঐক্যতান বাজাইয়া অপর এক ভাবুক কবি গাহিয়াছেন—

"যদি বা বিলয় পাব এ জগৎ, লুপ্ত হয এ মানব বংশ,
যাদের মহিমাময এ অতীত তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।
চোখের সামনে ধবিযা বাখিয়া অতীতের সেই মহা-আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবেব রাজ্যে বচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।" †

এই প্রেমেব ভাবতবর্ষ ভাবেব রাজ্য—জ্ঞান ও ধ্যানের সত্য-স্বরূপ। এ ভারতবর্ষ কোন রাষ্ট্রীয় সীমারেখা দ্বাবা সীমাবদ্ধ নয়, অথবা কোন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিষয় নহে। ইহাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

* অন্ধ বিল্বমঙ্গল ভাবিযাছিলেন যে, ভগবদ্দর্শন তিনি যদি লাভ করিতে পারিতেন তবে উত্তর কালের সাধক ভক্তের সুবিধার জন্য উপনিষদে নাম-রূপের অতীত বলিয়া বর্ণিত ঈশ্বরের রূপ লিখিয়া রাখিয়া যাইতেন। কিন্তু যখন তাঁহার অভীষ্ট পূরণ হইল তখন লিখিতে বসিযা আবিষ্ট প্রেমিক মাত্র দুই ছত্র লিখিলেন—

"মধুরম্ মধুরম্ বপুরস্য বিভো
মধুরম্ মধুবম্ বদনং মধুবং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্ মধুবং॥"

† দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এবং ভারতের সত্তার সঞ্জীবনী শক্তি। ভারতীয় সভ্যতা নিত্যকালে সমগ্র ভারতের চিরন্তন ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-কোনরূপ ধর্মাচরণ ও ক্রিয়া-কাণ্ডের আদিতেই এই বিরাট ভারতীয় সমগ্রতার স্মরণ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়া লইবার নির্দেশ আছে ভারতবাসীর উপর।—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

এই মন্ত্রে সারা ভারতের জলপ্রবাহ একত্র করিয়া পবিত্র কর্ম আরম্ভ করিবার নির্দেশ আছে। সে জলপ্রবাহ সারা ভারতের প্রাণ-প্রবাহের ঐক্যের নির্দেশ দিয়া সভ্যতা ও ধর্মের ব্যাপকতার কথাই জানাইয়া দেয়। কিন্তু এই ঐক্য রাষ্ট্রীয় ঐক্য নয়, বা রাষ্ট্রনীতির জাতীয়তাবাদের ঐক্য নহে। এই ঐক্যের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—

"প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতা * রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন

* ('স্বদেশ'—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা')

[এখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-সভ্যতা বলিতে আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা মাত্র ধরিয়াছেন বলিলে ভুল করা হইবে। হিন্দু সভ্যতা বলিতে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বুঝাইয়াছেন যাহা সুরু হইয়াছে আর্য-হিন্দুগণের আগমনের বহু পূর্ব হইতে এবং যাহা আজও চলিতেছে। এই 'হিন্দু সভ্যতা' বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন ভারতবর্ষের 'গ্রামীন' সভ্যতা যাহা রাষ্ট্র-দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে এবং যাহার ভিত্তি সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন বা সামাজিক শাসন। এই সভ্যতা শুধু হিন্দুর ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। এদেশের মুসলমান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই 'গ্রামীন' বা সামাজিক স্বাধীনতা এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।]

থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

"......আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।

"আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

ভারতীয় ঐক্যগাথা প্রচারের জন্য যে সকল বাউল বীণার তারে সুর বন্ধ হইতে দেন নাই এবং যে সকল যাজ্ঞিক হোমের আগুন মুহূর্তের জন্যও নিভিতে দেন নাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সর্বপ্রধান। কিন্তু তিনি কখনই রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতীয় নেশন বা 'জাতি' গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন নাই। ভারতবর্ষীয় ঐক্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বহু ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কর্কশ চীৎকারে ভারতের প্রাণধর্মী সুললিত ঐক্যতন্ত্র ছিঁড়িয়া সুরঝঙ্কার বেসুরা করিতেও পারে। ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেশ ও জাতি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লইয়া মিলিত হইবে আশীষ লইবার জন্য—

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।"

এ ভারতবর্ষ জাতি নহে, মহাজাতি সদন। এখানে মিলিত হইবে বিভিন্ন জাতি ভূমার সন্ধানে। সেই মহাজাতিই নৃপতিকে শিখাইতে পারে "ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি—ধরিতে দরিদ্র বেশ"। কোন একটা 'দেশ' বা একটা 'রাষ্ট্রের' পক্ষে এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐক্য-মন্ত্রের মধ্যে 'জাতি' কথা ব্যবহার করেন নাই। কারণ, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ভারতীয় ঐক্যকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিতে চাহেন নাই। রাষ্ট্রীয় জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াই 'ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' ভারতের ভাগ্য-বিধাতার শুভাশীর্বাদ লইবার জন্য পাঞ্জাব-সিন্ধু প্রভৃতি দেশ সমবেত হইবে। এই পথেই প্রকৃতভাবে ভারতবর্ষের মহাজাতির ঐক্যবিধান সম্ভব।

বাংলার তথা ভারতের বাণীসাধক দিকপাল চারণদের মধ্যে একমাত্র নজরুলের গানেই সর্বভারতীয় জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা 'জাতি' কথা দেখা যায়।

"জননী গো জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী **স্বদেশ আমার ভারতমাতা**।"

আবার—

"গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলেছে আগের মতো, কইরে আগের মানুষ কই ?
মৌনী স্তব্ধ সে হিমালয়
তেমনি অটল সে মহিমাময়,
নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি,
আমরাও আর **সে 'জাতি' নই**।"

বাংলার বাণী-মন্দিরে সর্বভারতীয় ঐক্য সাধনের বেদীতে নিয়মিত পূজারী আর এক দিকপাল অতুলপ্রসাদ। নযাবাংলার রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে প্রবাসে তাঁহার সাধনা-মন্দির স্থাপিত ছিল। তাঁহার সঙ্গীতেও ভারতীয় 'জাতির' উল্লেখ পাওয়া যায়।—

"ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশকোটি দেহ হবে একপ্রাণ,
এক-জাতি প্রেম বন্ধনে।"

কিন্তু তাঁহার এই এক-জাতি প্রেম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের দাবী কিনা তাহা খুব স্পষ্ট নহে। কারণ, পরক্ষণেই রবীন্দ্রনাথের সুরে তিনিও গাহেন—

"এস অবনত, এস হে শিক্ষিত
পরহিত ব্রতে হইয়া দীক্ষিত
মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান
মিল হে মায়ের চরণে॥"

আবার এই ভারতীয় ঐক্যেরই স্বরূপ বিস্তার করিতে গিয়া সুরশিল্পী গাহিয়াছেন—

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে **মহাজাতির** উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়।"

সাধকের চিন্তায়, গায়কের সুরে, ঋষির ধ্যানে ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ 'মহাজাতি'—স্বল্প পরিধির রাষ্ট্রীয় 'জাতি' নহে।

(২)

সর্বভারতীয়-ঐক্যবোধ সামগ্রিক-সত্তাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ বাঙালী স্বদেশ সেবক, বাণীসাধক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাবীরের দান। বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী মনীষী ও বাণীসাধকগণ জাতিকে জাগাইবার জন্য দেশের দুর্গতি ও দেশের গৌরব বলিতে ভারতের দুর্গতি ও গৌরবই বলিয়াছেন এবং জাগিবার জন্য ডাক দিয়াছেন সমগ্রভাবে ভারতবাসীকে, যদিও তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল বাংলাদেশের মধ্যেই। ১৮৫১ 'খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্' স্থাপনের পর হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার দেশপ্রেম ভারতীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়াছে। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলাদেবীর বীরাষ্টমী ব্রতের চেলা-রা এবং কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলেই ভারতের যশোগান গাহিয়া দেশবাসীকে জাগাইতে থাকেন। এমন কি পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ ইংরেজের সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার আগেই রাজা রামমোহন রায় 'স্বাধীন ভারতের' স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন।*

রামমোহনের পরে, বিশেষত ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫ বৎসর কাল বাংলায় স্বদেশ প্রেমের যে বন্যা আসে তাহাতে দেশপ্রীতি ও জাতি-প্রীতি থাকিলেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী লইয়া রাষ্ট্রনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। জনসাধারণের দৈনন্দিন অধিকারের বা প্রয়োজনের দাবী পৃথক পৃথক ভাবে জানান বা আদায় করা ব্যতীত তখনকার স্বদেশ-প্রেম কোনরূপ স্বাধীন-রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা জাতীয়তাবাদে রূপ গ্রহণ করে নাই। কর্মিগণ দেশবাসীকে

* হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'—১ম খণ্ড—৫ পৃঃ।

জাগাইয়াছেন, অন্ধ তমসা ত্যাগ করিয়া আলোকের ও প্রকাশের পথে আত্মঘোষণার জন্য আত্মস্থ হইবার ডাক দিয়াছেন। স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্ন তাঁহারা দেখিয়াছেন হয়তো, এবং এই স্বদেশ প্রেমের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বীজ তাঁহারা বপন করিয়াছেন। কিন্তু সে রাষ্ট্রের বাস্তব প্রকাশ কি হইবে, সে বীজের অঙ্কুর উদ্গম হইবে কোন পথে, এ নির্দেশ তাঁহারা দিতে চেষ্টা করেন নাই। গতিহীন সমাজের নিশ্চলতা দূর করিবা গতিশীল জাতির ভবিষ্যৎ তাঁহারা ভবিতব্যের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। রামমোহনের 'স্বাধীন-ভারত' ('Independent India') মানচিত্রের নির্দিষ্ট সীমারেখার ধার ধারে নাই। তখনও পাঞ্জাব ও সিন্ধু ইংরেজের রাজ্যভুক্ত হয় নাই। তবুও রামমোহনের "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া" ছিল "Friend of the United Kingdom of Great Britain and Ireland" (গ্রেট ব্রিটেনের মিত্র রাষ্ট্র)। 'চতুঃসীমানার রাষ্ট্রনীতি' (Geopolitik) সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ভূগোল, মানচিত্র, এমন কি ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন থাকায় রামমোহনের 'স্বাধীন ভারত'ও কোন বাস্তব 'রাষ্ট্রিক' জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক হয় নাই।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পর হইতেই বাংলার তথা ভারতের স্বদেশ প্রেম রাষ্ট্রনীতির পর্যায়ভুক্ত হইতে থাকে এবং রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জন্ম লাভ করে। 'আমার দুর্গোৎব' (১৮৭৫), 'আনন্দমঠ' (১৮৮১) এবং 'পলিটিক্স্' প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদের মূল 'সপ্তকোটি' দেশবাসী, আর উপায় 'ভক্তি' এবং কর্মপদ্ধতিতে 'বৃষজাতীয়' বলিষ্ঠের পলিটিক্স্।—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব'। নিজের পায়ের উপরে নিজে নির্ভর কর।"

বঙ্কিম রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বীকার করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় চেতনা ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে

ভারতীয় ঐক্য স্থাপনের সহজ সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক পন্থা বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় ঐক্য বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন মতৈক্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য নহে। তিনি ভারতে 'জাতীয় সম্মিলন' চাহেন নাই, চাহিয়াছেন 'ভারতীয় সর্ব-জাতীয় সম্মিলন'। তিনি বলিয়াছেন "ভারতবর্ষীয় **নানা জাতি** একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যম না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।"*

রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মন্ত্র দাতা ও প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় চিন্তা বঙ্কিমের মতো বলিষ্ঠ ও ঋষির ধ্যান-দৃষ্টিতে সুদূর প্রসারী ছিল না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী ও কর্মবীর। তাই তিনি ভারতের 'নানা জাতিকে' এক জাতিতে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখেন এবং সেই অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন (১৮৭৬) ও পরে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রতী হন।

'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামে মাত্র 'ইণ্ডিয়ান' হইলেও আসলে ছিল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান, † এবং চিন্তাধারায় ও ভাবে উহা ছিল ষোল আনা বাঙ্গালী। এমন কি 'ইণ্ডিয়ান' নাম দিয়া 'ভারতীয়' প্রতিষ্ঠান গঠনে আপত্তি করিয়া বরং একটা বঙ্গীয় সমিতি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি সুরেন্দ্র-নাথের প্রখ্যাত-নামা সহযোগিগণ। ‡

---

* বঙ্গদর্শন—১৮৭২।

† ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—'History of Indian National Congress'—Vol. I.—P. 10.

‡ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'—প্রথম খণ্ড—৩৮ পৃঃ।

'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে' সর্বভারতীয় কার্যক্রমের আদর্শ থাকিলেও উহা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে পারে নাই, এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আশাও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতে পারে নাই। উহার লিপিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী ছিল চার দফা—

(1) Creation of a strong body of public opinion in the country.

(2) Unification of *Indian races and peoples* upon the basis of common political interests and aspirations.

(3) Promotion of friendly feelings between Hindus and Mahommedans.

(4) Inclusion of the masses in the great public movements of the day.

[(১) দেশের জনমত প্রকাশের জন্য একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন।

(২) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার সাধারণ সূত্রের ভিত্তিতে **ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতি সমূহকে** একত্রিত করা।

(৩) হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুভাব বর্ধন।

(৪) সমসাময়িক প্রধান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনগুলির মধ্যে 'জনসাধারণকে' টানিয়া লওয়া।]

এই চার দফার দ্বিতীয় দফায় যে রাজনৈতিক মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়—"ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতিগুলিকে এক সাধারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে মিলিত করা"—তাহা আসলে বঙ্কিমের 'ভারতের সর্ব-জাতীয় সম্মিলন' (১৮৭২) ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই 'common political interests and aspirations' এর উপর নির্ভর করিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্থাপনে অগ্রণী হন। কিন্তু তিনি যদি 'Indian Association'এর মধ্যেই কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখিতেন তবে তাঁহার জাতি-সৃষ্টি কার্য (Nation in the Making) বেশীদূর অগ্রসর হইত না। কারণ, তখনও রাষ্ট্রীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার কোন সাধারণ সূত্র ভারতময় দানা বাঁধে নাই। এই সাধারণ সূত্র ইংরেজ-বিরোধিতা। এই সূত্র শক্ত করিয়া পাকাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ভারতময় ঘুরিয়া বেড়ান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিয়া ভারতময় জাতীয়তা প্রচার করিতে থাকেন।* ইল্‌বার্ট্‌ বিলের ব্যর্থতায় (১৮৮৩) তাঁহার সুবর্ণ সুযোগ আসে এবং এই সূত্রে সারা ভারতকে গ্রন্থিবদ্ধ করিতে তিনি অগ্রসর হন। ইলবার্ট বিলের পরিণতির তিক্ত পরিবেশে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে' আহুত জাতীয় সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা ও একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করেন এবং স্বমত প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন।

এই ভাবে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' উদ্বোধন হয়। এই কার্যে সুরেন্দ্রনাথ ও 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' সহিত প্রধান উদ্যোগী হয় 'বোম্বে এ্যাসোসিয়েশন' ('বৃটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন'

---

* সুরেন্দ্রনাথের এই অক্লান্ত কার্যের দ্বিধাজড়িত ও বিকৃত স্বীকৃতি ডাঃ পট্টভির গ্রন্থে দেখা যায়—"It is believed that the idea of organising a vast political gathering was first Conceived by Surendranath Banerjee under the inspiration furnished by that gathering of the Princes and people of India in 1877" (দিল্লী দরবার)—History of Indian National Congress—Vol. I.—P. 10.

অনুকরণে বোম্বাই সহরে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে স্থাপিত,) পুণার 'সার্বজনিক সভা' (১৮৭৫) মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী, মিঃ হিউম্-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন' এবং 'বোম্বে প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৮৫)। প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন আনন্দমোহন বসু, দাদাভাই নৌরজী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চার্লু, বিজয় রাঘব আচারী এবং সর্বোপরি মিঃ হিউম্ প্রভৃতি নেতাগণ।

এই সকল নেতৃবৃন্দের কাহারো ছিল না বঙ্কিমের মতো প্রসারিত দৃষ্টি এবং ঋষির বলিষ্ঠ তেজ। ভারতীয় জাতীয়তা গঠনে সুরেন্দ্রনাথের মতো বিশ্বাসের দৃঢ়তাও ইঁহাদের ছিল না। তাই একদিকে কংগ্রেস পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে আবেদন-নিবেদনের মডারেট প্রথা আর অপরদিকে দেখা যায় ভারতের জাতীয় সত্তা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ঘোষণায় কংগ্রেসের দ্বিধা ও সঙ্কোচ। এমন কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মিঃ হিউম্ ইহার কার্য পরিধি রাজনীতির বাহিরে সামাজিক প্রশ্নাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন ভারতের জাতীয়তাবাদিগণকে 'সুসঙ্গত আলোচনার গণ্ডীর' মধ্যে রাখিয়া রাজদ্রোহ কার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ-সম্ভাবনা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক জাতীয়বাতাদের কথা সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন ব্যতীত আর কেহই বিশ্বাস করেন নাই। মিঃ হিউম্ প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাজনীতি চর্চার ভার রাখিয়া 'অরাজনৈতিক' ও 'সামাজিক' বিষয় বিবেচনার জন্য কংগ্রেসের 'অল ইণ্ডিয়া নেশনাল্ য়ুনিয়ন' (All India National Union) 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল্ য়ুনিয়ন' (Indian National Union) প্রভৃতি নামাকরণের চেষ্টা করেন; এবং এই ভাবেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণাতে 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল্

য়ুনিয়ন' সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়। অবশেষে 'বেঙ্গল নেশনাল্ লীগের' অনুকরণে ঐ সম্মেলনের নাম রাখা হয় 'ইণ্ডিয়ান্ নেশনাল্ কংগ্রেস'।*

'ইণ্ডিয়ান নেশনাল্ য়ুনিয়ন' অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমন্ত্রণ পত্রে লেখা হয়—

"to enable all the most earnest labourers in the cause of national progress *to become personally known to each other*.

"Indirectly this conference will form the germ of a *Native* Parliament, and, if properly conducted, will constitute in a few years an unanswerable reply to the assertion that India is still *wholly unfit* for *any form of* representative institutions."

"দেশের উন্নতিকল্পে বিশেষ উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে **পরস্পরে ব্যক্তিগতভাবে জানাশুনা করিবার** উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন।......

"পরোক্ষে এই সম্মেলন একটা **নেটিভ্** পার্লামেণ্টের বীজ বপন করিবে এবং উপযুক্ত পরিচালনায় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ যে এখনও **যে-কোন ধরণের** প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে **একেবারেই অনুপযুক্ত** এই উক্তির অবিসংবাদী প্রত্যুত্তর দিবে।"]

ইহার মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যতে মডারেট্ নেতৃত্বের প্রভুপদ সেবার বাহিরের কোন অবস্থার নির্দেশ নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্ব ঘোষণা নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও অনুরূপ আশা প্রকাশ নাই। 'নেটিভ্' পার্লামেণ্ট ছাড়া 'জাতীয়' পার্লামেণ্টের দাবী নাই।

---

* ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—'History of I. N. Congress'—Vol. I—P. 35

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে চার-দফা-উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতেও সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের পরিচয় নাই।—(1) The promotion of personal intimacy and friendship amongst all the more earnest workers in our country's cause in the various parts of the Empire.

(2) The eradication by direct friendly personal intercourse, of all possible race, creed or provincial prejudices amongst all lovers of our country and the fuller development and consolidation of *those sentiments of national unity that had their origin in our beloved Lord Ripon's ever memorable reign.*

(3) The authoritative record, after this has been carefully elicited by the fullest discussion, of the maturest opinions of the educated classes in India on some of the more important and pressing of the social questions of the day.

(4) The determination of the lines upon and methods by which during the next twelve months it is desirable for Native politicians to labour in the public interests.

[(১) সাম্রাজ্যের (ভারতসাম্রাজ্যের) বিভিন্ন অংশের নিষ্ঠাবান কর্মিগণের মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য বর্ধণ।

(২) হৃদ্যতাপূর্ণ ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত আলোচনা দ্বারা আমাদের সকল দেশ-প্রেমিকগণের মধ্যে জাত, ধর্ম ও প্রদেশ-গত

সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণ এবং আমাদের **জনপ্রিয় বড়লাট লর্ড রিপনের চিরস্মরণীয় 'রাজত্ব' কালে জাতীয় ঐক্যের যে সকল ভাব ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে** সেগুলি পরিপোষণ ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) প্রয়োজনীয় ও জরুরী সামাজিক সমস্যাগুলিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত অভিমত নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করা।

(৪) দেশী (নেটিভ্) রাজনীতিকগণের পরবর্তী বার মাসের জন্য জনস্বার্থমূলক কর্মধারা নির্ধারণ।] .

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্যাবলীতে ভারতীয় রাষ্ট্র ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের নামগন্ধ নাই। ইহাতে ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথা আছে, ভারতবাসীর জাত, ধর্ম ও প্রাদেশিকতার উল্লেখ আছে, দেশী (নেটিভ্) রাজনীতিকদের সমাবেশ আছে, 'জনপ্রিয়' ইংরেজ বড়লাটের আমলে জাতীয় ঐক্যের ভাবধারা উদ্ভবের কথা আছে, কিন্তু মানচিত্রে ভারতীয় জাতীয়তার সীমানা নির্ধারণের ইঙ্গিত নাই। পরের বৎসর সুবিবেচনা করিয়া 'সঙ্গত' পথে চলার জন্য উৎকণ্ঠা আছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মতামতের খতিয়ান আছে, কিন্তু অশিক্ষিত 'ছোট লোকের' দাবী নাই।

ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্যের স্বীকৃতি সেদিন বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্র-চিন্তানায়কদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই, এবং ভারত সরকারের দপ্তরেও স্থান পায় নাই। তাই কংগ্রেসের প্রস্তাবে 'ভারতীয়' বা 'Indian' কথার স্থলে দেখা যায় 'Native' বা 'দেশী আদমী' বলিয়া দেশবাসীকে সম্ভাষণ। আবার ভারত সরকারের দপ্তরেও 'ইণ্ডিয়ান' কথার বদলে 'নেটিভ্স্ অব ইণ্ডিয়া' কথাই দেখা যায়।*

---

* ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত এক সিদ্ধান্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয়—'In future Natives of India are desirous of

কংগ্রেসের কোন নেতার মুখে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের কথাও উচ্চারণ হয় না। কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথ এই জাতীয়তা প্রচার করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লোকমান্য তিলকের কারাবরণে কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন,—"For Mr. Tilak......my feelings go forth to him in his prison house. *A Nation* is in tears." [মিঃ তিলকের জন্য আমার মন তাঁহার কারাগৃহের প্রতি ছুটিয়াছে। একটা জাতি আজ অশ্রুসিক্ত।] 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে' সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মিগণও ভারতীয় জাতীয়তার কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করেন।। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে সভাপতি লালমোহন ঘোষ বলেন, "We are not a self-Governing Nation" [আমরা স্বায়ত্ব-শাসনাধিকারপ্রাপ্ত জাতি নই]। কিন্তু বাংলার বাহিরের কোন নেতার মুখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা বড একটা শুনা যায় নাই। বিংশ অধিবেশনেও সভাপতির (স্যার হেনারি কটন্) অভিভাষণে কংগ্রেসের আদর্শ নির্দেশ দেখা যায় "A Federation of free and separate States, the United States of India" [স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সমূহের স্বেচ্ছায় মিলিত ভারতের যুক্তরাষ্ট্র]।

ভারতীয় জাতীযতাবাদের চিন্তাধারায় ভাব-প্রবণ বাঙালীর জাতীয় জীবনের কোমল স্পর্শ ছাড়া আর কিছু নাই! মানচিত্র বিস্মৃত হইলে ভারতীয় ও বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ একই। উহা বাঙালীর জাতীয়তাবাদ। কিন্তু ভারতের মানচিত্র যদি বাংলার এই কমনীয় ভাবরাজ্য গ্রহণে অস্বীকার করে তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ খান খান হইয়া

---

entering the Educational Department......" [ভবিষ্যতে ভারতের দেশী লোকেরা (নেটিভ্) শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক]—ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—প্রথম খণ্ড—৩২ পৃঃ।]

ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাংলার বাহিরের কোন সাধক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কোনই তত্ত্বনির্দেশ করিতে আজও পারেন নাই।

এই দুর্বলতার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাষ্ট্রীয় ইমারত শক্ত ভিৎএর উপর নির্মিত হয় নাই। একদিকে নেতৃবৃন্দের দৃঢ় রাষ্ট্র-চিন্তার অভাব এবং অন্যদিকে তাঁহাদের মডারেট ভিক্ষা-প্রবৃত্তি ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণকে পশ্চাতে টানিয়াছে। নীল-চাষীর গণ-সংগ্রামের ডঙ্কা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জাতির জীবনে যখন উচ্ছল যৌবন-তরঙ্গ, অগ্নি-ঋষি যেখানে উদাত্ত আহ্বান করিয়াছেন,—"এস ভাই সব, ওই অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়ি,...মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?", কংগ্রেসের প্রস্তাবে তখন সাবধানে হিসাবী পদক্ষেপ! জাতি যখন সপ্তকোটির নিনাদে মুখর, সর্বভারতীয় কংগ্রেস তখন 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামত' 'বিশেষ বিবেচনার পর' লিপিবদ্ধ করিয়া কর্তব্য শেষ করে! জাতি যেখানে গণনেতৃত্বের আহ্বানে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ৬০।৭০ মাইল ব্যাপী আবালবৃদ্ধবণিতার গণ-সমাবেশে নিজেদের দাবী আদায় করিতে বদ্ধপরিকর, সর্বভারতীয় নেতৃবৈঠক তখন ইংরেজী-শিক্ষিত কর্মিগণের ব্যক্তিগত ঙ্মতাপূর্ণ সাম্বাৎসরিক অধিবেশনে দেশবাসী কোনরূপ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সম্পূর্ণই অযোগ্য কি-না সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া নেটিভ্ পার্লামেণ্টের বীজ সংগ্রহে ব্যস্ত! এমন কি 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন্' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করে (Inclusion of the masses in the great public movements of the day) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের উদ্দেশ্য তাহার কত নিম্ন স্তরের ভীতু রাজনীতির পরিচয় দেয়! পূর্ণ ৬০ বৎসর ব্যর্থ আবর্তে ঘুরিয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান আবার গণ-সংযোগের (mass-contact) প্রস্তাব মাত্র

গ্রহণ করে। কিন্তু ৮০ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে নদীর দুইকূল প্লাবিত হইয়াছিল ৬০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ প্রতীক্ষমান পল্লীবাসী নীল-চাষীর সমাবেশে রাজশক্তির নিকট দাবী পেশ করিতে ও আদায় করিতে।

যে উদ্দেশ্য লইয়াই সুরেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক জাতীয়তাব স্বপ্ন তাঁহার সফল হয় নাই। উহাতে সংগ্রাম শক্তি পঙ্গু ও খর্ব হইয়াছে মাত্র।

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব মন্থর নিষ্ক্রিয় নেতৃত্ব দেশ তখন মানিয়া লয় নাই। এই নেতৃত্ব যখন শব্দেব তাৎপর্যেব দিকে গভীর ভাবে আইনজ্ঞেব দৃষ্টি লইয়া অতি সাবধানে দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনেব অসঙ্গতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছিল বাংলার জাতীযতাবাদ তখন গণনেতৃত্বের আশ্রয়ে বৈপ্লবিক প্রকাশেব পথ খুঁজিতেছিল। মাদ্রাজে পঞ্চদশ অধিবেশনে কংগ্রেস যখন উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থিব করে—'নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারত-সাম্রাজ্যেব অধিবাসী জনগণেব স্বার্থ ও মঙ্গল প্রসার' (to promote by constitutional means the interests and well being of the people of the Indian Empire), স্বামী বিবেকানন্দ তখন পশ্চিম পৃথিবী জয় করিয়া (১৮৯৭) বাংলায় পাঞ্চজন্য ধ্বনি করিতেছিলেন যুবক সম্প্রদাযকে আত্মস্থ করিয়া প্রবল মন-শক্তি উদ্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে। জীবকে শিবজ্ঞানে 'দরিদ্রনারায়ণ'-বাণী মারফৎ জাতি-গঠন, জনসেবা, শিক্ষাবিস্তার ও জাতীয চরিত্রগঠন করিবার জন্য তিনি বাঙালী যুবক গণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। অন্যদিকে বাংলার জনসাধারণ জাগ্রত হইযা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল সহরে ও গ্রামে অভূতপূর্বরূপে। পেনেল সাহেবের বিচার বিবয়ে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী ও বরিশালে চাষী মজুর জনসাধারণ যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ উত্তেজনার পরিচয় দেয় আমলাতন্ত্র ও ভারতের শাসন-যন্ত্র তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া যায়।

সেদিন নোয়াখালীর যে জাগ্রত জনশক্তি জাতীয় সম্মান বোধ ও ন্যায়-বিচারের মর্যাদা বোধের পরিচয় দিয়াছিল তাহার সহিত ৪৫ বৎসর পরের (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের) নোয়াখালীর উন্মত্ত পাশবিকতার তুলনা করিয়া বাঙালীর এই অধঃপতনের দায়িত্ব লইবে কে?

বাংলার এই গণজাগরণের প্রভাব ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রতিফলিত হয়। পরবর্তী বঙ্গ-বিপ্লবের কর্ণধারগণের পরিচালনায় এবং জাগ্রত জনশক্তির পরিবেশে এই অধিবেশনে বক্তৃতা ও আলোচনা খুব প্রাণবান হয়, কিন্তু কংগ্রেসের লক্ষ্য ও চিন্তাধারা থাকিয়া যায় যে-তিমিরে সেই তিমিরেই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাই সর্বভারতীয় মন্থর নেতৃত্বের অপেক্ষা না করিয়াই বাংলার বিপ্লব বন্যা দুর্বার গতিতে সারা দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলে—যৌবন জলতরঙ্গ বাধ ভাঙ্গিয়া আপনার স্বাভাবিক উচ্ছলপথ কাটিয়া লয়। নিয়মতান্ত্রিকতা পরিহার করিয়া বলিষ্ঠ স্বাধীন পথের এই বিপ্লব। উহা একাধারে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক, স্বদেশ-গঠন-মূলক ও আইন অমান্যের আন্দোলন। জাতীয় শাসন পরিষদ (National Council of Administration), জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education), ও জাতীয় বিচার পরিষদ (National Council of Arbitration) মারফৎ উহা বিলাতী পণ্যবর্জন, বিলাতী শিক্ষালয় বর্জন এবং বিলাতী আদালত ও শাসনযন্ত্র বর্জন করিয়া স্বদেশী শিল্পের পোষণ, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও জাতীয় আদালতে সুবিচার প্রার্থনার পরিকল্পনায় প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়।

এই উদ্ধত আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন বিপিন পাল। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সংগ্রামে নীরব ও উদ্বিগ্ন দর্শক মাত্র। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্রের

বক্তৃতা ও আন্দোলনের ব্যাখ্যায় কংগ্রেসের অপরাপর নেতৃবৃন্দ আপত্তি করিতে থাকেন.* এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে তাঁহার বক্তৃতা উত্তেজনামূলক এই অভিযোগে মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে তিনি বহিষ্কৃত হন। কলিকাতা অধিবেশনে বাংলার বিপ্লব সম্পর্কে তিনটি ভাল মানুষের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিলাতী বর্জন সম্বন্ধে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এই আন্দোলন 'বিধিসঙ্গত' (legitimate) বলিয়া রায় দেয়। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিয়া কংগ্রেস দেশবাসীকে দেশী জিনিষ তৈয়ার করিতে ও কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্বদেশী মাল খরিদ করিবার জন্য সুপারিশ করে। 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া কংগ্রেস দেশে জাতীয় পরিচালনায় জাতীয় ধারায় শিক্ষা দেওয়ার সময় আসিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করে এবং 'জাতীয় বিচার পরিষদের' নামও উচ্চারণ করে না। এমন কি এই প্রস্তাবও পরবৎসর সুরাট-অধিবেশনে পরিহার করিবার উদ্যোগে কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়।

বাংলার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বোম্বাইতেও পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কংগ্রেস-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলন গড়িয়া ওঠে লোকমান্য তিলক ও পাঞ্জাবকেশরী লজপত রায়ের নেতৃত্বে। তিলকের 'শিবাজী-উৎসব' মারাঠা জাতিকে নূতন প্রাণ দান করে এবং ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে এক বিপুল সংগ্রামশীল শক্তির উন্মেষ করে। তিলকের মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বলিষ্ঠ বাহু এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মডারেট নিষ্ক্রিয়তা হইতে

---

* Babu Bipinchandra Pal gave an extended application to the word boycott and interdicted all association with Government. Provinces other than Bengal sought to exempt themselves from the operation of the resolution on Boycott.—Dr. Pattavi Sitaramiya—Vol. I—P. 84.

কংগ্রেসকে উদ্ধার করিবার 'দক্ষযজ্ঞে' প্রধান সহায়ক। 'শিবাজী-উৎসব' মারফৎ মারাঠার গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া যে মারাঠা জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় তাহা ভারতবাসীকে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিবার পথ নির্দেশ করে, এবং 'গ্রাম-মণ্ডপ' বা 'গণপরিষদের' পথে গণনেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হইয়া জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করে। মারাঠা জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীকে শিখায়, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, আমি তাহা আদায় করিবই" (swaraj is my birthright and I will have it), এবং এই স্বরাজ আদায়ের পথ তোষণ ও সহযোগিতা নয়—শাসকের সহিত সংগ্রাম করা ও তাহাকে প্রতিপদে বাধা দেওয়া। মারাঠা জাতীয়তাবাদের দাবীতে তিলক শুধু 'ব্রিটিশ ভারতের' মারাঠা নহে, মারাঠা দেশীয়-রাজ্যপুঞ্জ ও দাক্ষিণাত্যের প্রভাবশালী জায়গীরদার ও ইমামদার দিগকে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তার চিন্তায় সমবেত করিয়াছিলেন।*

এই সকল অগ্রগামী চিন্তা ও কর্মবীরেরা বাংলা, মারাঠা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি নিজের নিজের এলাকায় জনগণকে স্বকীয় বিশিষ্ট ধারায় জাতীয় ভাবে প্রণোদিত করিয়া ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে সম্মুখে ঠেলিয়াছেন। তাই তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'জাতি' (নেশন্) কথা বড একটা ব্যবহার করেন নাই যেমন করিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ, গোখেল ও পরে ডাঃ বেশান্ত প্রমুখ মডারেট নেতাগণ। † উত্তরকালে ভারতের

---

* ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—১ম খণ্ড—৯৫ পৃঃ।

† ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গোখেল বলিয়াছেন—"The pledges of equal treatment which England has given us have supplied us with a high and worthy ideal for *our Nation* [আমাদের সহিত ব্যবহারে সাম্যের যে সব অঙ্গীকার ইংলণ্ড করিয়াছে তাহা আমাদের জাতির সম্মুখে একটা উচ্চ ও গৌরবের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে]—ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—১ম খণ্ড—৮৯ পৃঃ। আবার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী বেশান্ত বলেন—

জাতীয়তাবাদী ইতিবৃত্তকার এই ভারতীয়-নেশন বাদ প্রচারকগণকে বলিয়াছেন 'মডারেট' আর তিলক প্রভৃতি স্বতন্ত্র নীতিবাদিগণকেই আখ্যা দিয়াছেন 'জাতীয়তাবাদী' (nationalist). *

ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় জাতীয়তাবাদের পরিধির দ্বন্দ্ব চলিয়াছে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর কংগ্রেসে 'মণ্ট্-ফোর্ড' শাসন-সংস্কারে সহযোগিতা করিবার স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে বিঘ্নসৃষ্টির ক্ষমতা তিনি রাখিবেন। আবশ্যক ক্ষেত্রে কর্মপন্থার সেই স্বাতন্ত্র্যের দাবীতেই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে সভাপতি-পদ ত্যাগ করিয়া 'মণ্ট্-ফোর্ড' শাসন-সংস্কার অচল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলায় ও মারাঠীদের সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশে, এবং মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় দিল্লী ও সিমলায় স্বতন্ত্র পন্থায় রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিবার জন্য 'স্বরাজ্য'দল গঠন করেন। ইতিহাস জানে, সর্বভারতীয় নেতৃত্বের এই অস্বীকৃতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে বিভিন্ন অংশের স্বাতন্ত্র্য কত কার্যকরী হয় এবং 'মণ্ট্-ফোর্ড' শাসন-সংস্কারের দ্বৈতনীতির গোঁজামিল অচল করিয়া কি ভাবে এই স্বাতন্ত্র্য ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামকে সম্মুখে ঠেলিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের মতো প্রকৃত দেশবন্ধুরা জানিতেন, কর্মক্ষেত্রের আয়তন সঙ্কীর্ণ করিয়া অক্লান্তভাবে গভীর অভিনিবেশের সহিত কাজ করা

India claims the right as *a Nation*, the justice among the peoples of the Empire." [জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের অপর সকল জাতির সহিত সুবিচার দাবী করে]—ঐ—১১৯ পৃঃ।

* "*Nationalists* wanted Lokmanya Tilak to preside, but the *moderates* were opposed to this" [জাতীয়তাবাদিগণ লোকমান্য তিলককে সভাপতি নির্বাচন করিতে চাহিলেন কিন্তু মডারেটগণ তাহাতে বিরোধিতা করিলেন]—ঐ ৯৬ পৃঃ।

বিরাট এলাকা জুড়িয়া ব্যর্থ শক্তিক্ষয় করার চাইতে বেশী কার্যকরী। তিনি তাই সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র প্রাদেশিক নেতৃত্বের উপর কর্মভার অর্পন করিবার জন্য বিদ্রোহ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পরে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারা সম্পূর্ণ ভাবেই সর্বভারতীয় নেতৃত্বের হাতে চলিয়া যায় এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মুখ্য হইয়া ওঠে। মাঝে মাঝে বিরোধের যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, কিন্তু জাতীয়তাবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার ভিত্তিতে নহে। সেই কারণেই বৃহৎ এলাকায় শক্তিক্ষয় করিয়া 'কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল' ও 'ফরোয়ার্ড ব্লক' প্রারম্ভেই 'সাঙ্গ-লীলা' হয়।

(৩)

বিভিন্ন অংশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পরিণতি ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব। বিভিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বের সহযোগিতায় এদেশের সকল জাতির মধ্যে যে সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তে সর্ব ভারতীয় জাতীয়তার কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব বা 'হাই কমাণ্ডের' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় জাতির স্ফূর্ত বিকাশের প্রাণরসের উৎস শুকাইতে থাকে, এবং সর্বভারতীয় নেতৃত্বের লোভে জাতীয় সংগ্রামে দলাদলি প্রশ্রয় পাইতে থাকে।

কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের কর্মনীতিতে ভারতবর্ষে একজাতি তত্ত্ব প্রাধান্যলাভ করায় ভাষা ও সংস্কৃতি-গত বিভিন্ন স্বতন্ত্র-প্রকৃতি-ও-প্রবণতা-বিশিষ্ট জাতিগুলির নিজস্ব ধারায় বিকাশে এক মহাজাতি

গঠনের স্বাভাবিক ও সঙ্গত সাধনা পশ্চাৎবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। অস্বাভাবিক 'একজাতি'তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায় তেমনি অস্বাভাবিক 'দুই জাতি'-তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া সারাদেশময় বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে ভাষাগত প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয়। সেই সকল প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য, এবং প্রাদেশিক ভাষায় সরকারী কার্য পরিচালনাদ্বারা সর্বাধিক স্বায়ত্ব শাসনের পথে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রসারের দাবী জানান হয়।* প্রাদেশিক 'অটোনমি'র ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের স্বেচ্ছায় যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন এদেশের রাষ্ট্রনীতির স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া সর্বভারতীয় সংগঠনকামী মডারেটগণও প্রচার করিয়াছেন বা রাজনৈতিক কর্মধারার লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। লোকমান্য, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু ও পাঞ্জাব-কেশরী প্রমুখ 'উগ্রপন্থি'গণ তো সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে বেগবান শক্তি সমাবেশ

* "Wide and strong was the belief that the Provincial autonomy to be successful the medium of instructions as well as administration must be the Provincial languages and that the failure of the British administration, notably in the domain of local Self-Government is undoubtedly due to the pell-mell admixture of populations in British Provinces which are carved out not on logical or ethnological but on chronological basis."

[প্রাদেশিক অটোনমি সফল করিতে হইলে শিক্ষা ও শাসন পরিচালনা প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত, এ বিশ্বাস খুব প্রবল ও ব্যাপক হয়। বৃটিশ শাসনের—বিশেষত স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে বলা হয়, প্রদেশগুলিতে 'হ—য—ব—র' ভাবে অধিবাসী বন্টন করা, কেন না বর্তমান বৃটিশ প্রদেশগুলির সীমানা টানা হইয়াছে গড্ডালিকা-স্রোতের ধারায়—কোনরূপ যৌক্তিকতাপূর্ণ বা সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে নয়।]—ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া—"History of Indian National Congress—Vol. I. P. 147

ও প্রাদেশিক সমস্যাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেনই। লোকমান্য তিলক প্রাদেশিক বিষয়-গুলিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে গৌণ বিবেচনা করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর দেশবন্ধু সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াও প্রয়োজন মতো প্রাদেশিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পন্থা গ্রহণের স্বাধীনতা দাবী করেন এবং সেই নীতিতেই গয়া কংগ্রেসে বাংলা ও মহারাষ্ট্র লইয়া বিঠলভাই ও মতিলালের সহযোগিতায় 'স্বরাজ্য' পার্টি স্থাপন করেন।

দেশবন্ধুর পর হইতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব 'এক-জাতি' মতবাদে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দিয়া ভাষাগত রাষ্ট্রীয় বিকাশের সহজ পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সারা ভারতের উপর একটি বিশেষ 'রাষ্ট্র-ভাষা' জোর করিয়া চাপাইয়া একরূপ নয়া সাম্রাজ্যবাদ পত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইংরেজীর বদলে হিন্দুস্থানী 'রাষ্ট্রভাষা' কোনক্রমেই সুস্থ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মাতৃভাষা মারফৎ জাতির বিকাশের পথ সহজ করিবার মতো প্রেরণায় গ্রহণ করা হয় নাই। উহা আসলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সাদা সাম্রাজ্যবাদের স্থলে এক প্রকার অশ্বেত সাম্রাজ্যবাদ পত্তনের প্রয়াস। তাই আজ একদিকে পাকিস্থান স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী-উর্দু মিলিত তথাকথিত সহজ 'হিন্দুস্থানীর' আওয়াজ শেষ হইয়া হিন্দী ভাষা সেই আসন গ্রহণ করিতেছে, অথচ উর্দুভাষী জনসাধারণের বোল আনাই 'হিন্দুস্থান' বা নব পর্যায়ের 'ভারতবর্ষের' এলাকাভুক্ত থাকিয়া যাই-তেছে। অন্যদিকে ভারতের অপর সকল ভাষার বিকাশের পথ বন্ধ করিবার জন্য হিন্দী অথবা অগত্যা ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করিবার নীতি চালু হইতে বসিয়াছে। এই নীতির স্পষ্ট পরিচয় মেলে কংগ্রেসের সমর্থক 'অখণ্ড' জাতীয়তাবাদী ভারতের বিখ্যাত 'দার্শনিক' অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের সাম্প্রতিক উক্তিতে। ভারতবর্ষে ভাষা লইয়া

বিতর্ক সম্পর্কে অধ্যাপকের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে স্যার সর্বপল্লী বলেন—

"While I advocate the use of the mother tongue as the medium of instruction, in a University like this (Benares) where students who have different mother tongues assemble, we have to adopt the policy which the Central Government and the Union Constitution *are adopting.* But there must be two languages in which instruction is imparted, namely *Hindi* and English. Hindi will be the suitable medium for all those whose mother tongue is Hindi, and *Edglish, for all those whose mother tongue is Bengali, Punjabi, Marathi, Gujrati, etc.*" *

[মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান সমর্থন করিলেও বারাণসীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে নানা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীর সমাবেশ হয়, সেখানে আমাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকার ও (ভারত) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে গৃহীত নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু **হিন্দী** ও ইংরেজী এই দুইটি ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের শিক্ষার বাহন হইবে হিন্দী, আর **ইংরেজী হইবে বাংলা, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাভাষীদের শিক্ষার বাহন**।]

বাংলা, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কেন দেওয়া হইবে না তাহার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের

* United Press of India—Benares—July" 11, 1947.

শাসনতন্ত্রে গৃহীত নীতি (the policy which the Central Government and the Union Constitution are adopting), অর্থাৎ হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্যের জবাব অচিরেই বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও মারাঠীর নিকট হইতে মিলিবে,, ভারতের উন্নতিতে বিশ্বাসী ও আশাবাদী মাত্রেই এ কথা হলফ্ করিয়া বলিবে।

সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আশীর্বাদ-পুষ্ট আসামের প্রধান মন্ত্রী ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সমগ্র অতীত অগ্রাহ্য করিয়া সগর্বে ঘোষণা করিতে সাহসী হইয়াছেন যে, ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রদেশ গঠনের আপাতত সমাধি হইয়াছে।* সকল সন্দেহের অবসান করিয়াছেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীহট্ট ও কাছার **চিরকাল** আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, এই আশ্বাস ঘোষণা করিয়া।† আর সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারিগণ মুসলমান উচ্ছেদের আবরণে 'লাইন প্রথা' মারফৎ আসাম হইতে বাঙালী বিতাড়ন ও 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' মারফৎ বিহারে বাঙ্গালী নির্যাতন চালাইয়া আসিতেছে

* "The days of linguistic or even cultural basis for demarkation of Provincial boundaries appear to have gone at least for the present"—[ভাষাগত বা এমন কি সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমানা নির্ধারণের যুগের আপাতত অবসান হইয়াছে ধরা চলে।]—গোপীনাথ বরদলুই—গৌহাটী, ৮ই জুন, ১৯৪৭—এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস।

† "From the very inception of the Province of Assam Sylhet and Cachar have been integral parts of it and I hope they will always remain so" [আসাম প্রদেশ গঠনের সুরু হইতেই শ্রীহট্ট ও কাছার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং আমি আশা করি, চিরকালই জেলা দুইটি এই ভাবে থাকিবে।]—আচার্য কৃপালনী—শ্রীহট্ট, ৩০শে জুন, ১৯৪৭—এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

অবলীলাক্রমে। আবার বাংলার পক্ষ হইতে যখন বাংলার প্রধান মন্ত্রী মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বিহারের কুক্ষিভুক্ত বাংলার অংশগুলি ফিরিয়া পাইবার দাবী করেন তখন তাঁহার বিরোধিতায় সর্বভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মুসলমানের ক্ষতি হইবে, অতএব তাহাদের সেই দাবী হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত এইরূপ সাম্প্রদায়িক যুক্তির অবতারণা করিতে দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করে নাই।* এই যুক্তি হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া মিঃ

---

* বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলার অংশগুলি বাংলায় ফিরাইয়া দিবার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার "India Divided" গ্রন্থে এই যুক্তির অবতারণা করেন (৩৯৬—৯৭ পৃঃ।)—

"In the population of the eastern zone, (of Pakistan), as it will be when these districts are included within it, the Muslims will be actually in a minority of 48·34 per cent., and whatever justification there is for claiming a separate independent State of Muslims on the basis of their being in a majority in the population of an area ceases to exist after this territorial adjustment. Even if we take the total papulation of the two zones together, the proportion of the Muslim population will be reduced from a small majority of 55.23 per cent. to a nominal majority of 52·71 per cent."

[এই জেলাগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত করিলে (পাকিস্থানের) পূর্ব এলাকার জনসংখ্যায় মুসলমানেরা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। তাহাদের আনুপাতিক সংখ্যা হইবে শতকরা ৪৮·৩৪ ভাগ। ফলে অঞ্চলবিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মুসলমানগণের স্বতন্ত্র স্বাধীন-রাষ্ট্র স্থাপনের দাবীর স্বপক্ষে যাহাও কিছু যুক্তি আছে এই সীমানা বদলের পরে (পূর্বাঞ্চলে) তাহাও আর থাকিবে না। এমন কি (পূর্ব ও পশ্চিম এই) দুই অঞ্চল একত্র করিয়া ধরিলেও মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৫৫·২৩ ভাগের নগণ্য গরিষ্ঠতা হইতে শতকরা ৫২·৭১ ভাগের নামে-মাত্র আধিক্যে পর্যবসিত হইবে।

জিন্না বাংলার পক্ষে উত্থাপিত এই দাবীর নিন্দা করেন ও দাবীদারগণকে নীরব করাইয়া দেন। সাম্প্রদায়িক বিভাগে দেশ খণ্ডনে জাতীয়তাবাদিগণের বিরোধিতা আন্তরিক হইলে তাঁহারা বরং বাংলার এই দাবীই সমর্থন করিতেন।

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার ফলে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব আর এক দিক দিয়া জাতীয় সংগ্রামীদিগকে ব্যর্থ দ্বন্দ্বের পথে ঠেলিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশকে নিজ নিজ স্বতন্ত্র নীতি নির্ধারণের সুযোগ না দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর চালবাজীর কাছে হারিয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু যেখানে মাত্র বাংলা ও মধ্যপ্রদেশের সহযোগিতায় স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বনে সারা ভারতে আমলাতন্ত্র-সর্বস্ব সাম্রাজ্যবাদীকে পরাস্ত করেন, সাম্রাজ্যবাদী যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নীতি প্রয়োগ করিয়া জাতির সংগ্রামশীল শক্তির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য দমননীতি চালাইতে থাকে, এবং এমন কি কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগও যেখানে এক প্রদেশে আমলাতন্ত্রের সাহায্যে শাসন চালাইয়া অন্য প্রদেশে আইন অমান্য দ্বারা কার্যসিদ্ধি করে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব সেখানে সারা ভারতে অন্ধের মতো একই নীতি পরিচালনা করিয়া সংগ্রামশক্তি হারাইয়া ফেলে এবং সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতার আওতার মধ্যে গিয়া পড়ে।

ভারতীয় রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ বা এক-জাতি তত্ত্বের কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক পন্থা অস্বীকার করিয়া সংগ্রামের নেতৃত্ব হইতে জনসাধারণকে দূরে রাখিয়াছে। বরং জনগণকে চূড়ান্তভাবে অবিশ্বাস করিয়া 'মাননীয় নেতৃবৃন্দের' সিদ্ধান্ত তাহাদের উপর চাপাইয়াছে ও উপর হইতে 'হাই কমাণ্ড'-এর ফতোয়া ঝাড়িয়া রাষ্ট্রনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়াছে। যাহাকে বলা হইতেছে 'স্বাধীনতা', যাহার নাম দেওয়া হইল 'গণপরিষদ' দেশের 'ছোটলোক' তাহার

নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। বাঙালী জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আদেশ আসে 'হাইকমাণ্ড' বনাম দুইটি (কংগ্রেস ও লীগ) অবাঙালী কর্ম-পরিষদের ফতোয়া মারফৎ। 'আত্মবিস্মৃত জাতি' সেই ফতোয়া পাইয়া সোল্লাসে মাতিয়া যায় আত্মহত্যায়। পরক্ষণেই সর্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঠেকিয়া যায় 'পাখতুন জাতীয়তার' শিলাময় বাধায়। এদিকে 'স্বাধীন' ভারতের 'গণপরিষদের' সদস্য পদ বরখাস্ত করিয়া নয়া নির্বাচনের নির্দেশ আসে বৃটিশ সরকারের আজ্ঞাবহ মাউণ্টব্যেটেনের ফতোয়ায়, আর গণসংযোগহীন নেতৃত্ব উহাই স্বাধীনতার রাজপথ বলিতে বলিতে আত্মপ্রতারণার সাথে প্রভুপদ অনুসরণ করিতে থাকে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জনজাগরণের কথা। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে নরনারী-বালক-বৃদ্ধ সমেত বাংলার চাষী সমবেত হয় কুমার নদ ও কালীগঙ্গার উভয়পার্শ্বে ৬০।৭০ মাইল ব্যাপিয়া দীর্ঘ জনতায় নীল-দাদন প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের কথা। ৪৫ হাজার বাঙালী চাষী-মজুরের সহিযুক্ত আবেদন পেশ করেন কংগ্রেসের অধিবেশনে অশ্বিনী দত্ত। ১৯০১ সালের কথা। নোয়াখালী সহরে ছয় হাজার চাষী-মজুর ধনী-নির্ধনের জনতা ধাবিত হয় ন্যায় বিচারের মর্যাদা দিতে রাজরোষে পতিত পেনেল সাহেবের সমর্থনে। আর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। দিল্লীর মসনদে সমাসীন ইংরেজ বড়লাট ঘরোয়া পরামর্শে সিদ্ধান্ত করিয়া ফতোয়া ছাড়ে 'স্বাধীনতা' দানের। জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করে, কি আসিতেছে?—জবাব পায় না। 'ছোটলোক' প্রশ্ন করিয়া চলে, 'চা'ল তেল আর কাপড়ের দাম কমিবে কি?' 'স্বাধীনতা'-বিজয়ী নিরূপায় নেতৃত্ব এ প্রশ্নের কোন জবাব দিবার সময় পায় না। কারণ, তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমানের মধ্যে এবং পাঞ্জাবী হিন্দু-শিখ

ও পাঞ্জাবী মুসলমানের রাজ্যের সীমানার ঝগড়া ও দাঙ্গাবাজী পাকা করিতে।

আজ গণশক্তি হইতে বিচ্যুত ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দেশে আত্মধ্বংসী বৃটিশ রোয়েদাদ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া অসহায় নেতৃত্ব সেই বিষফলই গ্রহণের জন্য দেশবাসীর কাছে সুপারিশ করিয়াছে এবং এই পরাজয় বরণের পক্ষে কোন যুক্তি দেখাইতে না পারিয়া শুধু পদত্যাগের হুমকিদ্বারা মুখরক্ষা করিতেছে।

নয়াদিল্লীতে 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি'র (A. I. C. C.) অধিবেশনে ১৪ই জুন (১৯৪৭) তারিখে মহাত্মা গান্ধী যে বক্তৃতা দেন তাহাতে ইংরেজের সহিত আপোষকারী পক্ষদ্বয়ের এক দলের নেতৃত্বের স্বরূপ স্পষ্ট হইয়া পড়ে। তিনি বলেন—

If at this stage the A.I.C.C. rejected the Working Committee's decision what would the world think of it ? All the parties had accepted it and it would not be proper for the Congress to go back on its words. If the A.I.C.C. felt so strongly on this point that this plan (Mountbatten plan) would do injury to the country then it could reject the plan. *The consequence of such rejection would be the finding of a new set of leaders* who could constitute not only the Congress Working Committee but also take charge of Government. If the opponent of the resolution could find such a set of leaders it could then reject the resolution

if it so felt......... *The members of the Working Committee were old and tried leaders who were responsible for all the achievements of the Congress hitherto, and, in fact, they formed the backbone of the Congress*, and it would be most unwise, if not impossible, to remove them at the present juncture. All congressmen should understand what his duty was at this time and do it silently. Out of mistakes sometimes good emerged........."I admit that whatever has been accepted is not good. But I am confident, good will certainly emerge out of it".

He conceded that the house had the right, but they must remember that the Working Committee as their representatives had accepted the plan and it was the duty of the A.I.C.C. to stand by them.*

[এই অবস্থায় পৌঁছিয়া যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে, তবে সারা দুনিয়ার লোকে ভাবিবে কি? সকল রাজনৈতিক দলই এই পরিকল্পনা (মাউণ্টবেটেন পরিকল্পনা) গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষে কথা দিয়া অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যদি সত্যই মনে করে যে এই পরিকল্পনা দেশের

---

* এ. পি. প্রচারিত রিপোর্ট—অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৫ই জুন (১৯৪৭) তারিখে প্রকাশিত।

পক্ষে ক্ষতিকর হইবে তবে ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। **কিন্তু তাহার ফলে নূতন আর এক দল নেতৃবৃন্দ বাছিয়া লইতে হইবে** যাঁহারা শুধুই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবেন তাহা নয়, গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেও সমর্থ হইবেন। সেরূপ একদল নেতা খুঁজিয়া যদি পাওয়া যায় তবেই প্রস্তাবের বিরোধিগণ ইহা বর্জন করিতে পারেন। **ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত নেতৃবৃন্দ। তাঁহারা এযাবৎ কংগ্রেসের সকল সাফল্যের মূলে ছিলেন এবং বস্তুত তাঁহারাই কংগ্রেসের মেরুদণ্ড।** এই সঙ্কটক্ষণে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করা অসম্ভব না হইলেও অবিবেচিত হইবে। এক্ষণে সকল কংগ্রেস্-কর্মীর কর্তব্য কি তাহা অনুধাবন করিয়া নীরবে পালন করা উচিত। ভুলভ্রান্তির মধ্যেই অনেক সময় কল্যাণ আসে। "আমি স্বীকার করি যে, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার সবই ভাল নয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ইহাতে পরিণামে কল্যাণই হইবে।"

তিনি (গান্ধীজী) পরিষদের অধিকার স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদেরই প্রতিনিধিরূপে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন: অতএব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কর্তব্য তাহার সমর্থন করা।]

নেতৃত্বের এই ভয়ঙ্কর বর্ণনা মানবজাতির সম্মুখে দারুণ বিপদ সূচনা করে। পৃথিবীর গণ-আন্দোলন ও গণনেতৃত্ব ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের এই স্বরূপ ব্যাখ্যায় লজ্জায় অধোবদন হইবে। 'মাননীয় নেতৃবৃন্দ' যদি জনগণকেই নীতিনির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিতেন তবে আর এমনভাবে দেউলিয়া হইয়া পড়িতেন না। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

(৪)

অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবাদ ইংরেজের সৃষ্টি। ইহার অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবেই * এই প্রামাণ্য সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'অখণ্ড-ভারতীয়' জাতি-সৃষ্টির নজীর নাই। সমগ্র দেশকে এক-রাষ্ট্রভুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে বহুবার, কিন্তু সম্ভব হয় নাই কোন দিনই। ভারতীয় সভ্যতা বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রয়োজন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'হিন্দু সভ্যতা' 'নেশন' গঠনের প্রয়াসী ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রা, নীতিশাস্ত্র প্রচার ও শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম্য সমাজের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের পথে এই সভ্যতার অভিব্যক্তি ও বিস্তার। শাসন যন্ত্রের মৌলিক কর্তৃত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবেই জনগণের হাতে এবং দেশের কৃষক, মজুর ও 'ছোটলোকের' অধিকারে। এর ভাবেই স্বৈরাচারী রাজা ও রাজচক্রবর্তীর অধীনেও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন সম্ভব হইযাছিল, এবং এমন কি উপর্যুপরি রাষ্ট্র-বিপ্লবেও এই শাসনধারা অব্যাহত ছিল।

বহিরাক্রমণ ইত্যাদি উপদ্রব প্রতিরোধের জন্য এবং বিভিন্ন জনপদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তার জন্য রাজতন্ত্র এদেশে প্রচলিত ছিল। এমন কি বিজয়ী রাজচক্রবর্তীর অধীনে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টাও এদেশে বহু প্রাচীন। কিন্তু তাহাতে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হয় সর্বত্র বিরোধ-শক্তি প্রবল হইয়াছে, না হয় সম্রাটের অধীনস্থ রাজাদের সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিযাই রাজচক্রবর্তী অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞে প্রণামী লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

---

* আমাদের জনপ্রিয় বড়লাট লর্ড রিপনের চিরস্মরণীয় 'রাজত্ব' কালে জাতীয় ঐক্যের যে সকল ভাবধারা গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির পরিপোষণ ও দৃঢ়ীকরণ।

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রচেষ্টার ক্ষীণ আভাস মেলে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে। সে উদ্যোগের প্রধান বিধায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বঙ্গদেশ হইতে গান্ধার পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নরপতিগণের সমাবেশ হয়—দুইটি বিরোধী শিবিরে। এক পক্ষকে পরাজিত ও উচ্ছন্ন করিয়া বিজয়ীপক্ষ কর্তৃত্ব পায় সারা ভারত দখলের। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রক্ষেত্রে সফলতা আসে কি পরিমাণ তাহার হিসাব পুরাণে নাই। বিজিত সাম্রাজ্যে রাজা পরীক্ষিৎ কোনরূপ জাতীয়তা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন কিনা ইতিহাসে তাহা লেখে নাই। কুরুক্ষেত্রের ফলে ঐক্যবদ্ধ এক ভারতীয় রাষ্ট্রের বদলে বরং পাওয়া গিয়াছে 'মহাভারত'—সারা জগতের জন্য মহিমাময় ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র এবং মানবের যুগ—সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার।

মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য এবং পরবর্তী যুগে আলাউদ্দীন খিলজী, মহম্মদ তোগলক, সম্রাট আকবর ও ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যগুলি এক এক যুগে এক এক ভাবে মানচিত্রের বিভিন্ন সীমারেখার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল সাম্রাজ্য কোন দিনই রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ আনিতে পারে নাই। কারণ বিজয়ীর ব্যক্তিগত জয়গৌরব ও অর্থলিপ্সা ব্যতীত আর কোন বিজ্ঞান-সম্মত নীতিবোধের উপর এ সকল সাম্রাজ্য বিস্তার হয় নাই। এক একটা সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসে চারুশিল্পের এক একটা গৌরবময় যুগের পরিচয় বহন করে বটে, কিন্তু তাহার জন্য কৃতিত্ব কেবলমাত্র সম্রাটের ব্যক্তিগত মর্জির এবং দরবারের বিশেষ পরিবেশের। জনসাধারণের মনের যোগে এসব সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই এবং জনগণ রক্তমূল্যে ইহা রক্ষা করিয়া জাতীয়তায় রূপান্তরিত করে নাই। যে মুহূর্তেই সম্রাটের দুর্বলতা ও অক্ষমতায় শাসনযন্ত্রের যোগ্যতা অবনত হইয়া দণ্ড বিন্দুমাত্র

শিথিল হইয়াছে তখনই দিকে দিকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়াছে। মধ্যভারতে মহারাষ্ট্র এইভাবেই শিবাজীর নেতৃত্বে ভারত সাম্রাজ্যকে আঘাত করিয়া উদ্ধত সাম্রাজ্য-বাদী ঔরঙ্গজেবকে পর্যুদস্ত করিয়াছে। বাংলার প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় আকবরের ভারত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া জাতীয়তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ঈশা খাঁ, হুসেনশাহ্ প্রভৃতি নরপতিগণ নানান কৌশলে দিল্লীর দরবার হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। নবাব আলীবর্দী দিল্লীর সহিত সকল সম্পর্কই একরূপ ছিন্ন করিয়া দেন। রাজপুতনার প্রতাপসিংহ জাতীয় স্বাধীনতার ভাস্বর জ্যোতিষ্ক, আর পঞ্চনদের গুরুগোবিন্দ সিংহ জাতীয় স্বাধীনতার মৃত্যুহীন প্রেরণা।

এই সকল যুদ্ধ জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম, এবং স্বাধীনতার—দেশ-সেবার লড়াই। ইহাকে গোষ্ঠী প্রেম (Group patriotism) অথবা দলগত মনোভাব (sectarianism) বলা নিতান্ত ভুল। কারণ, এই সকল সংগ্রামের মধ্যে দেখা যায় জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ় গ্রন্থি যাহার উপর ভরসা করিয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্ভব হইয়াছে। জাতি এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছে এবং দেশের ডাকে রক্ত-তিলক পরিয়াছে। স্বাধীনতার পূজারী মারাঠা যেমন বাংলার দেশসেবকের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে তেমনি আবার পরস্বাপহারক স্বাধীনতার শত্রু মারাঠা বর্গী হইয়াছে বাঙ্গালীর ঘৃণার পাত্র, এবং মারাঠা বিতাড়ক আলীবর্দী হইয়াছে বাঙালীর আপনার প্রতিনিধি। বাংলার সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই মোহনলাল ও মীরমদন প্রাণদানে অমর হইয়াছে। বিজিত দেশ দখল না করিয়া জাতির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দানেই ভারতের 'রামরাজত্ব'।

ইংরেজের সাম্রাজ্য যে ভারতবর্ষ, ইহা সম্পূর্ণ নূতন এক ভারতবর্ষ। ভারতের ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্যের নিদর্শন আর নাই। পূর্বে

যে যে দেশ জুড়িয়া ভারত সাম্রাজ্য নানান যুগে বিস্তৃত হইয়াছে তাহার সবগুলি একত্রে লইয়া ও শুধু বর্তমান আফগানিস্থান বাদ দিয়া এই সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইংরেজের সৃষ্ট এই ভারতবর্ষ পূর্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে এমন কথা নাই। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' চিরকালই ছিল এবং আছে। ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাব ও সিন্ধু বিজয়ের পূর্বেও ভারতের 'জাতীয় মুক্তির' চিন্তা করিয়াছেন নয়াভারতের স্রষ্টা রামমোহন। আবার পাঞ্জাব ও সিন্ধু বিজয়ের পরেও ভারতের 'জাতীয়' মুক্তির সংগ্রাম চলিয়াছে। 'ভারতীয় জাতীয়তা' এই মুক্তি-সংগ্রামে সীমাবদ্ধ। মুক্তি-সংগ্রামের বাহিরে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষীয় (রাষ্ট্রিক) জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, ইংরেজ-বিরোধিতা উহার প্রাণ-রস। ইংরেজ শাসনের পরিবর্তনে উহার ভিত্তিমূল আলগা হইয়া পড়িবে, এবং ইংরেজ-বিরোধিতার অবসানে এই জাতীয়তাবাদ নিশ্চিহ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ব্রহ্মদেশ বিজয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাইয়াছে (১৮৮৫); ব্রহ্মদেশ ভারত-শাসনযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় জাতীয় সংগ্রামে ব্রহ্মদেশও ভারতবর্ষের অঙ্গভুক্ত হয়। আবার ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ভারত সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র 'ভারতীয় জাতীয়তার' আওতা হইতে ব্রহ্মদেশ বহিষ্কৃত হয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ ভারতে ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় ভারতীয় 'জাতির' অঙ্গভুক্ত হয়। আবার আজ পাকিস্থান অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইতেই ভারতীয় জাতির নূতন রূপ গ্রহণ হইতেছে এবং পাকিস্থানের সঙ্গে 'ভারতীয় যুনিয়নের' সীমানার প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'রাষ্ট্রপতি' "আমাদের সীমানা" বলিয়া ভারতীয় যুনিয়নের পক্ষ গ্রহণ করিতেছেন। রাজপুতনার মাড়োয়ারী জৈন আর নবদ্বীপের গৌড়ীয় বৈষ্ণব একই

জাতিভুক্ত আর ডায়মণ্ড হারবারের বাঙালী ধীবরের সমভাষী, সমজীবী, স্বগোত্র পূর্ববঙ্গের মৎস-জীবী আজ পৃথক 'জাতি'ভুক্ত!

এক শাসকের অধীনস্থ দেশের পরাধীনতা দূর করিবার জন্য ইংরেজ-বিরোধী ভাবধারাতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব। এই কারণেই বাঙালীর জাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন 'জাতির' ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই কারণেই সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারত ঘুরিয়া একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। ইল্‌বার্ট্‌ বিলের ব্যর্থতা ও রাউলাট্‌ বিল প্রভৃতি অপমানজনক ও দমননীতি পূর্ণ আইন পাশ হওয়ার সুযোগে এই প্রকার কার্য সম্ভব হয়। 'অরি-অরি-মিত্র' নীতি এই অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার মূলসূত্র।

সীমান্তের গান্ধী বাদশা খাঁ ও কংগ্রেস নেতা ডাঃ খাঁ সাহেব কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘোষণায় ভারতীয় জাতীযতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সীমান্তের 'পাখতুন' জাতীযতাবাদী আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইযাছে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিতে,—পাঠানের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিবার জন্য নহে।

More than a generation we struggled for freedom in the Frontier. In course of this struggle Pathans suffered great hardships but have never given up the struggle. Our struggle was against the British rule and domination and in this we allied ourselves with the Indian National Congress—the great orgnisation which was *similarly fighting* for freedom. Naturally, in the circumstances we found ourselves in close *alliance and comradeship with the Congress.*........

"Our struggle all along had been for freedom of India and *more especially of the Pathans.* We want complete freedom.·········

"···In the announcement of His Majesty's Government of June 3, it has been stated that referendum will be held in the N. W. F. P. where the only alternative which will be put before the electors of the present Legislative Assembly will be whether to join the Indian Union Constituent Assembly or the Pakistan Constituent Assembly. This limits our choice to two alternatives *neither of which we are prepared to accept.*"*

[এক পুরুষের অধিককাল ধরিয়া আমরা সীমান্তে আজাদী লড়াই করিয়াছি। ইহার মধ্যে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও পাঠানেরা সংগ্রাম ত্যাগ করে নাই। বৃটিশ শাসন ও অধীনতার বিরুদ্ধে ছিল আমাদের সংগ্রাম এবং এই সূত্রে আমরা **অনুরূপভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামরত** বিরাট প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত **মৈত্রী স্থাপন করি।** এই অবস্থায় স্বভাবতই আমরা কংগ্রেসের সহিত গভীর ঐক্য ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই।······

আমাদের সংগ্রাম ছিল বরাবরই ভারতের এবং বিশেষত পাঠানের স্বাধীনতালাভের জন্য। আমরা চাই পূর্ণ স্বরাজ।·········

বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সীমান্ত প্রদেশে গণভোট লওয়া হইবে যাহাতে বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচকমণ্ডলীকে হয় ভারতীয় য়ুনিয়ন গণপরিষদ, না হয় পাকিস্থান গণপরিষদ,

* খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ—২৫শে জুন, ১৯৪৭—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬শে জুন।

এই দুয়ের একটি পছন্দ করিয়া তাহাতে যোগ দিতে বলা হইবে। ইহাতে দুইটি বিকল্পের মধ্যে আমাদের নির্বাচন সীমাবদ্ধ করা হইবে **যাহার একটাও গ্রহণ করিতে আমরা সম্মত নহি।]**

বাদশা খাঁ আরও বলিয়াছেন—(৭ই জুন, ১৯৪৭)

"To think that we could be dominated by *outsiders* is beyond my comprehension." By 'outsiders' "I mean anybody other than the Pathan. And all those who belong to the Frontier Province are Pathans, and the Punjabis, Hindustanis and others are all outsiders". [বাহিরের লোকেরা আমাদের উপর আধিপত্য করিতে পারে একথা আমার ধারণার অতীত। 'বাহিরের লোক' বলিতে আমি বুঝি পাঠান ছাড়া আর যে কেহ। যাহারা সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী তাহারা সকলেই পাঠান, আর পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও অপর সকলে 'বাহিরের লোক'।]

অন্যান্য সীমান্ত নেতার উক্তিতেও এই কথাই ঘোষণা হয়—

"Pathans inhabiting both tribal and settled districts of the Frontier are flesh and blood of Pakhtoon race and, as such will ever remain strongly knit together whether in prosperity or adversity."*

"This is the life and death hour in the history of Pakhtoon. If the Public remain united, disciplined and organised, their future is bright and no power on earth can prevent them from attaining their cherished goal of Pathanistan.............

---

* ডাঃ খাঁ সাহেব—১৯শে জুন, ১৯৪৭।

"To-day we find in our midst hundreds of Punjabis who are out to create discord and strife amongst the Pathans. It is our duty to warn the *nation* from the coming danger." *

[সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতির এলাকায় যে সকল পাঠান বাস করে তাহারা পাখ্‌তুন বংশের রক্তমাংসে গঠিত। অতএব তাহারা সম্পদে বিপদে চিরকাল সুদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ থাকিবে।

পাখ্‌তুনের আজ জীবন মরণ প্রশ্ন। জনগণ যদি একতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সংগঠিত থাকে তবে তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত পাঠানিস্থান লাভে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।......

আজ আমরা আমাদের মধ্যে দেখিতেছি হাজার হাজার পাঞ্জাবী যাহারা পাঠানের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টায় আছে। এই আসন্ন বিপদে **জাতিকে** সতর্ক করিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য।]

"This (N W.F.P.) is the land of Pakhtoons and we shall never let the Punjabis or any one else to dominate us anyway We stand for the ideal of Pathanistan."†

[এ (সীমান্ত) পাখ্‌তুনের দেশ। আমরা কখনই পাঞ্জাবী বা অপর কাহাকেও কোনভাবে আমাদিগের উপর আধিপত্য করিতে দিব না। আমাদের আদর্শ 'পাঠানিস্থান'।]

ইংরেজ-বিরোধিতায় যে জাতীয়তার সৃষ্টি ইংরেজ-বিরোধিতা অবসানের সাথে তাহা অন্তর্হিত হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ শত্রুর

* ডাঃ খাঁ সাহেব—৬ই জুলাই, ১৯৪৭—পাঠানিস্থান দিবস উপলক্ষে।

† মিরওয়াজ খাঁ (উপজাতীয় এক জির্গার সর্দার)—২৯শে জুন, ১৯৪৭।

বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তির মেয়াদ যেমন সেই সাধারণ শত্রুর অবস্থিতি পর্যন্ত তেমনি বিরোধিতার ভিত্তিতে গড়া ঐক্য চিরস্থায়ী হইতে পারে না। জাতীয়তার মিলনরাখী বন্ধনের সূত্র তাহার মধ্যে নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাণ্ড্রাস'এর বিপর্যয়েব পর মিঃ চার্চিল ইংরেজ-ফরাসীর মিলিত জাতীয়তা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবের মূলে ছিল শুধু জার্মাণ-প্রতিরোধের সামরিক প্রয়োজন। ইংরেজ ও ফরাসী জাতিব দূরত্ব, পবস্পরে অবিশ্বাস ও স্বার্থ সংঘাত এবং সবোপরি প্রস্তাবেব আকস্মিকতা ও জার্মান আক্রমণের ত্বরিৎগতি মিঃ চার্চিলের এই অভিনব যুক্ত-জাতীযতা স্থাপনেব স্বপ্ন সফল হইতে দেয় নাই; হইলেও তাহার স্থিতি হইত সামযিক, যাহাব অস্তিত্ব যুদ্ধাবসানে রক্ষা করা সম্ভব হইত না।

বিবোধ যেখানে সংহতির মূল সেখানে নিত্য নূতন বিরোধেব পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া ঐক্যবক্ষাব উপায়ান্তর থাকে না। ইংরেজ-বিরোধিতা যখনই শিথিল হইয়াছে ভারতেব জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে তখনই অন্তর্বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গয়া কংগ্রেস, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ত্রিপুরী কংগ্রেস, এমন কি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসেব ঘটনা ইংবেজের সহিত বিবিধ রিফর্ম আইন মারফৎ সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায়েব প্রতক্ষ ফল। এই সকল ঘটনাতেই ভারতীয় রাষ্ট্রিক জাতীয়তাব প্রবণতা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ভারতশাসন যন্ত্র হইতে গা ঢাকা দিবার জন্য 'বিদায় লওয়ার' অভিপ্রায় ঘোষণা করিতেই ভারতের সমস্ত বিরোধ শক্তির মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বলিযা উঠিয়াছে। একদিকে স্থানীয় হিন্দু মুসলমানেব মধ্যে পরস্পরের হত্যা তাণ্ডব, অন্যদিকে পাখতুন জাতীয়তার ভারত হইতে সম্পর্কচ্ছেদ এবং সেই সঙ্গে ছোট বড দেশীয় রাজ্যেব রাজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা সর্বভারতীয় জাতীয়তা-

বাদকে বিদ্রূপ করে। বৃটিশ ভারতের অমুসলমান অঞ্চলগুলির ঐক্যও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবৃত্তির বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিরোধিতা দূর হইলে 'ভারতীয় য়ুনিয়নের' মধ্যে যাবতীয় প্রদেশগত স্বার্থদ্বন্দ্ব মাথা চাঁড়া দিয়া উঠিবে স্বাভাবিক নিয়মে। সর্বভারতীয় য়ুনিয়নের রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জীয়াইয়া রাখিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চিরস্থায়ী করিতে হইবে।

'গণতন্ত্র' ও 'জাতি'-তত্ত্বের অসুস্থ, অবৈজ্ঞানিক ও আত্মঘাতী পন্থা অনুসরণ করিতে বসিয়া আজ ভারতীয় য়ুনিয়নে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—তথা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্ট ভারতের 'গণপরিষদ'। এই প্রচেষ্টার মধ্যে আছে দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের সমস্ত অতীত অস্বীকার করিবার অভিপ্রায়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, প্রদেশগুলির পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় মিলিত যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন কংগ্রেসের আদর্শ। "This constitution, according to the Congress view, should be a federal one, with the largest measure of autonomy for the federating units.........."* [কংগ্রেসের মতে ভারতের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে হওয়া সঙ্গত। উহার বিভিন্ন সম্মিলিত অংশগুলিকে সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইবে এবং অনির্দিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) সমস্ত এই অংশগুলির অধিকারে থাকিবে।] কিন্তু আজ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস পরিচালিত 'গণ-পরিষদে' কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া যাবতীয় 'অনির্দিষ্ট' বিষয়গুলি কেন্দ্রের অধীন রাখিবার আয়োজন পাকা হইতেছে। এই মূলনীতি পরিবর্তনের সাফাই হিসাবে বলা হয় যে, যেহেতু এতদিন কেন্দ্র ছিল

* ৯ই আগষ্টের (১৯৪২) 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব।

ইংরেজের হাতে আর স্বায়ত্ব শাসন ছিল প্রাদেশিক ব্যাপার, কাজেই অবশিষ্ট বা রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা প্রদেশকেই দিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যত পারা যায় ইংরেজের হাতছাড়া করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশস্তি তখন গাহিলেও, আজ কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসায় এখন সেই নীতি নিষ্প্রয়োজন। আজ বলা হইতেছে "শক্তিশালী কেন্দ্র হইবে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসনশীল প্রদেশ সমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষার সেতু। সৌরজগতে সূর্যের সহিত গ্রহগণের যে সম্বন্ধ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সহিত প্রদেশ সমূহের সম্পর্ক তাহাই।" † এই যুক্তির মধ্যে বাক্যজালের কুজ্ঝটিকা ও ক্ষমতা-লোভ থাকিলেও সরলতা ও রাষ্ট্র চিন্তায় সততার অভাব। ইহাতে শক্তিমদমত্ততা থাকিতে পারে কিন্তু সামাজিক চিন্তায় দূরদর্শিতার পরিচয় নাই।

শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ। ভারতীয় সভ্যতা ও সামাজিক স্বাধীনতার উহাই একমাত্র আশ্রয়। বন্ধনহীনের ঐক্যই প্রকৃত শক্তিশালী ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম। সদ্য সমাপ্ত মহাযুদ্ধে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে সোভিয়েট দেশে। জার্মাণীর কেন্দ্রীভূত সামরিক যন্ত্র যখন সোভিয়েটে দুর্বার আঘাত হানিয়াছে, সেই অবস্থায় সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমস্ত সাধারণতন্ত্রগুলিকে (Republics) সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, এমন কি সামরিক ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কেও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা দানের সঙ্গতি-অসঙ্গতির যোগ্য পরিচয় মেলে ষ্টালিনগ্রাডে।

---

† আনন্দবাজার পত্রিকা—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—'কেন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি'—২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪।

৪। পাকিস্থান জাতীয়তাবাদ

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের উগ্র প্রতিক্রিয়া আধুনিক ভারতের 'পাকিস্থান জাতীয়তাবাদ'। এই জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের অখণ্ড রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্বীকার করে না, কিন্তু সারাভারতব্যাপী কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বে বিশ্বাসী। ইহা আবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অপেক্ষাও তীব্রভাবে বিকেন্দ্রীকরণ বিরোধী এবং গণনেতৃত্বে অবিশ্বাসী। ৩রা জুনের (১৯৪৭) মাউন্টবেটেন ঘোষণার মতো দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই নেতৃত্ব রুদ্ধদ্বার গোপন বৈঠকে। এ নেতৃত্বের কর্মক্ষেত্রের সীমানা বৃটিশ ভারতের চৌহদ্দি। এমন কি, পরোক্ষে বৃটিশ শাসিত তাঁবেদার দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও ইহার নজর নাই।* গণনেতৃত্বে অবিশ্বাসী, জনগণের স্বার্থে উদাসীন 'উচ্চ' বা অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ-চিন্তাপর ও সামন্তনীতির পরিপোষক নবাব নাজিম মৌলানার দল এই জাতীয়তাবাদের আশ্রয়। ইহা ভৌগোলিক সংস্থান, অর্থনৈতিক ঐক্য, ভাষা-সাহিত্য, গোষ্ঠী বা বংশপরিচয়ে বিশ্বাস করে না। এ জাতীয়তাবাদের পরিচয়-পত্র ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মান্তর গ্রহণেই ইহা ব্যক্তিকে ভিন্ন জাতিভুক্ত করে।† কোন্ প্রাচীন যুগে হাজার

---

* "The policy of the Muslim League has been and is, not to interfere with the Indian States in their internal affairs".—[ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই মুসলিম লীগের বরাবরের নীতি, এবং এখনও সেই নীতিই বলবৎ আছে]—মিঃ জিন্না, ২৫ শে মে, ১৯৪৭।

† ধর্মান্তর গ্রহণে 'জাতীয়তা' পরিবর্তনের প্রধান দাবীদার মৌলানা আক্রাম খাঁ।

বছর আগে কোন্ মরুভূমিতে উষ্ট্র ও মেষপালক মানুষের জন্য কি সমাজবিধানের ফতোয়া ঘোষণা হইয়াছিল সেই মাপকাঠিতে বর্তমান-কালে গো-মহিষ পালক, নদীমাতৃক জলাভূমিতে মৎসচাষীর জীবনধারা ও সামাজিক প্রথা নির্দেশ করিতে ব্যাগ্র এই জাতীয়তাবাদ।*

এই জাতীয়তাবাদ কোন তাগমূল্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্ধ তমসাচ্ছন্ন জাতিকে আত্ম-সত্ত্বস্থ করিয়া ব্যষ্টির সত্তার নির্মল প্রকাশ এবং সভ্যতার অগ্রগতির উদ্দেশ্যে মানবজাতির জন্য কোন সমুচ্চ আদর্শ এই জাতীয়তায় নির্দেশ হয় নাই। দেশ ও জাতির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লইয়া সাম্রাজ্যবাদীর সহিত বিরোধিতায় এই জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব হয় নাই। বরং স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষকের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষণে ইহা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।† এই জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব রাষ্ট্রনীতিতে সবিশেষ কৃতিত্ব

---

* "The camel may be taken as the symbol of that great transformation in the historical process which, proceeding from south western Asia as a spontaneous race urge, took in its sweep all the known world. ....The days of Arab greatness are past, but the camel is still the associate of man in a world distinct in its arid vastness and the essential uniformity of religion and culture of its inhabitants".

[উষ্ট্রকে ইতিহাসের ধারার সেই বিরাট সামাজিক বিবর্তনের প্রতীক ধরা চলে যাহা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্থিত হইয়া আপন সহজ গতিবেগে ধাবিত হইয়া সমগ্র জ্ঞাত পৃথিবী গ্রাস করিয়া লয়। ....আরব মহিমার যুগ অতীত হইয়াছে। কিন্তু উষ্ট্র আজও ধর্ম-ও সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ এবং ঊষর ভূমির ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (মুসলিম) পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রায় সহচর।] El Hamza, 'Pakistan—A Nation'—P. 72.

† "It is significant that questions about Pakistan were asked at this Conference (Joint Parliamentary Select Committee—1933). It is still more

দেখাইতে সমর্থ হয় "ভরতবর্ষে বৃটিশ শাসনের মতো বিশেষ অবস্থার সুযোগে"—"**some how that adility is tied up with the peenhir conditions of British Rule in India.**" *

অগ্নি-ঋষির দেশ ও জাতির প্রতি অনন্যা ভক্তির দাবী আর সাধক কবির জাতিসেবায় আত্মত্যাগ ও দেশের ভাবরূপ ধ্যানের কোন ঊর্ধ্বমুখী আহ্বাণ নাই এই জাতীয়তাবাদে। কর্মপন্থার মধ্যে আছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সহযোগিতায় দেশের বিপ্লবী-কর্মী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিরোধিতা করিয়া শাসকের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিয়া লওয়া। † ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস কর্তৃক 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আন্দোলন সুরু হইলে উহার মতলব খারাপ বলিয়া এই

---

significant that the initiative came from the British --they seem, from the record, to have pressed their questions while the Indian (Muslim) delegates seem uninterested and anxious to pass on to the next point"—Saukatullah Ansari, 'Pakistan—The Problem of India' --quoted in 'India Divided' —P. 207.

[ইহা খুব অর্থপূর্ণ যে এই সভায় (পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের যুক্ত কমিটিতে) পাকিস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা আরও তাৎপর্যপূর্ণ যে এই সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন ইংরেজরাই উৎসাহের সঙ্গে এবং নথিদৃষ্টে মনে হয় তাঁহারাই বারবার ইহার উপর জোর দিতে থাকেন যদিও ভারতীয় (মুসলমান) প্রতিনিধিরা এবিষয়ে নিরুৎসাহ থাকেন এবং অন্য বিষয় আলোচনায় ব্যাগ্রতা প্রকাশ করেন।]

* Jawaharlal Nehru —'Discovery of India'.

† ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিশেষত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নয়া শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর হইতে লীগ নেতৃত্ব ও ভারতের (প্রধান ঘাঁটি বাংলায়) শ্বেতাঙ্গ বণিক দলের মধ্যে রাজনীতিতে বরাবর পূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই নেতৃত্ব শ্বেতাঙ্গ-চালিত আমলাতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে শাসন কার্য (চা ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধিতা) পরিচালনা করে। ভারত সম্পর্কে মিঃ চার্চিল ও মিঃ আমেরীর এমন কোন ঘোষণা নাই যাহা এই নেতৃত্বের প্রতি অহেতুক সহানুভূতি ও দরদের পরিচয় দেয় নাই।

জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব সেই আন্দোলনের বিরোধীতা জ্ঞাপন করে, ও এক প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দেয় যে, মুসলমানের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া কংগ্রেসকে যদি কোন 'সুবিধা দান করা' হয় তবে এই নেতৃত্ব তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহাতে বিরোধিতা করিবে।* ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে এই নেতৃত্ব হিন্দু বিত্তশালীদল কর্তৃক বৃটিশের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া বৃটিশের পদে ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন অসম্ভব করিয়া মুসলমানকে পদানত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই সংগ্রাম পরিচালিত বলিয়া বিরুদ্ধ প্রস্তাব পাশ করে † † এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার-মুক্ত করিবার পূর্বে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব প্রত্যাহার করাইবার জন্য ইংরেজের চাইতেও বেশী উৎসাহে দাবী জানায়।

ইংরেজ শাসনের বিশেষ পরিবেশ ও সুযোগে উদ্ভূত সুবিধাবাদের ভূমিকায় আন্দোলন পরিচালনার ফলে এই জাতীয়তাবাদে একদিকে হইয়াছে ত্যাগ, দুঃখবরণ ও আত্মানুসন্ধানের অভাবে 'জাতির' চরিত্রবল

---

* (The working committee of the League) draw "The attention of the British Government that if any *concession* to the congress is made which adversely affects or militates against the Muslim demand it *will be resisted* by the Muslim League with all the power it can command.........".

† † "It is the considered opinion of the working committee (of the Muslim League) that this movement is directed not only to coerce the British Government into handing over power to a Hindu Oligarchy and thus disabling themselves from carrying out the moral obligations and pledges given to the Musalmans and other sections of the peoples of India from time to time, but also to force the Musalmans to submit and surrender to the congress terms and dictation.........".

ও সরলতার অভাব আর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতি, এবং অন্যদিকে হইয়াছে দেশবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অকারণে বিদ্বেষ প্রচার। তাই পাকিস্থান জাতীয়তাবাদের জন্য এ যাবৎ দেশবাসী ও অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বিদ্বেষ-বিষোদ্গার হইয়াছে তাহার এক আনাও হয় নাই দেশের শাসক ও শোষক, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে। আবার এই নেতৃত্বকে দেখা গিয়াছে সাম্প্রদায়িক অন্ধ উন্মত্ততায় পকিস্থানবাদের ধ্বজাধারিগণ কর্তৃক অপর সম্প্রদায়ের নারীহরণ ও নারীর মর্যাদাহানির মতো অপরাধও গৌণ বিবেচনা করিতে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে নোয়াখালীর বীভৎস তাণ্ডবের মধ্যে নারীধর্ষণের ন্যায় মহা অত্যাচারের সংবাদে বাংলার তথা সারা ভারতের মানবাত্মা যখন ক্রোধে গর্জন করিয়া ওঠে তখন সেই দুষ্কার্যের সাফাই গাহিয়া 'পূর্বপাকিস্থানের' প্রধান উজির দুর্জয়লিঙ্গ শৈল শিখর হইতে অবতরণ করিয়া এক বিবৃতি দিয়া বলেন যে নারীধর্ষণের খবর অতিরঞ্জিত, মাত্র ৩।৪ টি নারী অপহৃতা হইয়াছে—যেন মাত্র চারিটি নারীর মর্যাদাহানির অভিশাপ একটা সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়! ১০০ নম্বর হ্যারিসন রোডের নারীধর্ষণের ঘটনায় পকিস্থান-বাদী নেতৃত্ব যেভাবে অভিযুক্তের প্রতি প্রশ্রয়দানের মনোভাব ও তাহাদিগকে বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে তৎপরতাহীন দ্বিধাজড়িত চিত্তের পরিচয় দিয়াছে তাহা সভ্য জগতের কলঙ্ক।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মূলধন করিয়া জনগণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন রাখার জন্য দেশের ও 'জাতি'র প্রকৃত শত্রুর পরিচয় থাকে এই জাতীয়তা-বাদে অপ্রকাশ। জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ প্রকাশ না হওয়ায় উহা 'জাতি'কে পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংসের পথে টানিয়া লয়।

(২)

পাকিস্থান জাতীয়তাবাদের মূলকথা, ভারতবর্ষের মুসলমানগণ অমুসলমান অধিবাসী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা স্বতন্ত্র ও পরস্পরে-বিরোধী এবং তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রনীতিতে এক-জাতীয়তা স্থাপন অসম্ভব স্বপ্নবিলাস।* মুসলমানগণ একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক 'জাতি' এবং সেই কারণে অমুসলমান হইতে পৃথক্ একটা রাষ্ট্রস্থাপন মুসলমানের জন্য প্রয়োজন। † মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাম হইবে পাকিস্থান (পবিত্র বা ধর্মস্থান)।

---

* (Islam and Hinduism) "are, in fact, different and distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslims can evolve a common nationality. "...Presidential address at Lahore session- 1940—Mr. Jinnah [(ইসলাম ও হিন্দুধর্ম) প্রকৃতপক্ষে দুইটি স্বতন্ত্র সমাজ বিধান। অতএব হিন্দু ও মুসলমানগণ লইয়া যে এক-জাতীয়তা উদ্ভাবন সম্ভব এ কথা স্বপ্ন মাত্র]
আবার—"Their (Hindus and Muslims) habits and customs, social systems and moral codes, religious, political and cultural ideas, traditions, languages, literature, art and outlook on life are absolutely different from, nay hostile to, one another. These heterogencus essentials of their respective lives are not the elements which go to the formation of a nation—"Confederacy of India" by 'A Punjabi'—P. 150. [হিন্দু ও মুসলমানের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি ও নৈতিক বিধান, ধর্ম রাজনীতি ও সংস্কৃতির চিন্তাধারা, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং জীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক—এমন কি, পরস্পর-বিরোধী। তাহাদের জীবনযাত্রার এই ভিন্ন প্রকৃতি এক জাতি গঠনে সহায়ক নহে।]

† "Musalmans are a Nation according to any definition of a nation, and they must have their homelands their territory and their State."—Mr. Jinnah—Presidential address at Lahore session. 1940. [জাতীয়তার যে কোন সংজ্ঞায় মুসলমানগণ একটা 'জাতি' এবং তাহাদের নিজ বাস-ভূমি স্বদেশ ও রাষ্ট্র চাই-ই]

পকিস্থানে অন্য ধর্মাবলম্বী যাহারা পড়িবে অথবা যে সকল মুসলমান ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে তাহারা ভিন্নজাতীয় সংখ্যালঘু জাতি বা 'মাইনরিটি' সম্প্রদায় হিসাবে আশ্রয় ও সুযোগ সুবিধা পাইবে। এক 'জাতি' হিসাবে সেই 'মাইনরিটি' পকিস্থানের সম্পদে বিপদে পূর্ণ নাগরিক হইতে পারিবে না। এই রাষ্ট্রের বিধি পত্তন হইবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে। অতএব শরীয়তের ফতোয়ায় যাহার আস্থা নাই দেশের আইন কানুন প্রবর্তনে তাহার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। শরীয়ৎ রচনার পরে দেড় হাজার বৎসরে পৃথিবীতে মানবজাতি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহারে ভবিষ্যতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় সারা দুনিয়ার মানুষের সহিত একছন্দে অগ্রগতির প্রয়োজন নাই এই জাতীয়তাবাদে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র মুসলমান ও অ-মুসলমান বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় এই জাতীয়তার দাবীতে রাষ্ট্র গড়িতে গেলে মুসলমানের সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি মাপিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্র ভাগ করিয়া নূতন দেশের মানচিত্র আঁকার দরকার হয়। এবং সেই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের দুই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে ব্যবধান হইয়া দাঁড়ায় সহস্রাধিক মাইল। তাহাতেও সংখ্যাগুরু মুসলমান অঞ্চলে অমুসলমান সম্প্রদায় থাকিয়া যায় বিশেষ শক্ত এক দল হিসাবে। তেমনি মুসলমানের এক বৃহৎ অংশ (সোয়া নয় কোটির মধ্যে অন্তত সাড়ে চার কোটি) অমুসলমান-প্রধান অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিসাবে থাকিয়া ধর্মরাষ্ট্রকে নানাবিধ সমস্যা-সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিবে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাই বঙ্গীয় সীমানির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে সওয়াল প্রসঙ্গে পাকিস্থান জাতীয়তা-বাদীর পক্ষভুক্ত কৌঁসলি মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী বাস্তব ক্ষেত্রের চাপে পড়িয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন (২৩শে জুলাই, ১৯৪৭)—"What I want to stress is, which-ever way you divide you

cannot divide it (Bengal) into Hindu and Muslim territories. You cannot raise the question of culture, educational institutions" etc, (in this division.). [আমি যে কথার উপর জোর দিতে চাই তাহা এই যে, বাংলাদেশকে যেভাবেই ভাগ করুন না কেন, পুরাপুরি হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চলে ভাগ করিতে পারিবেন না এই বিভাগকার্যে সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কথাও তুলিতে পারিবেন না।]

'দুই জাতি' তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রাষ্ট্রের মধ্যে এক অস্বাভাবিক ব্যাখ্যায় 'ভিন্ন জাতির' বসবাস স্বীকার করিয়া লওয়া অথচ সেই জাতিদ্বয় এত স্বতন্ত্র যে তাহাদের পক্ষে একরাষ্ট্রে বসবাস করা নাকি সম্পূর্ণ অসম্ভব ! এক রাষ্ট্রে এই ভাবে দুই জাতির বসবাসের ন্যায় অস্বাভাবিক (!) অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য লোকাপসারণের প্রয়োজন ঘোষণা করা হয়* এবং পূর্ববঙ্গের পাটচাষী, মুসলমানের প্রতিবেশী ও নৃতত্ত্বে এক গোষ্ঠীভুক্ত নমঃশূদ্রকে বিহারের গমের ক্ষেতে সরাইয়া লওয়া আর রাজপুতনার জোয়াড়ভোজী মকাই চাষী মুসলমানকে আনিয়া পূর্ববাংলার পাটচাষীর প্রতিবেশীরূপে বসান সহজ স্বাভাবিক ও সঙ্গত বিবেচনা হয়। অ-মুসলমান রাষ্ট্র যদি

---

* "Sooner or later exchange of population will have to take place, and the Constituent Assemblies of Pakistan and Hindustan can take up the matter and subsequently respective Governments of Pakistan and Hindustan can effectively carry out the exchange of population whenever necessary and possible". —Mr. Jinnah, April 30, 1947 [আজ হোক কাল হোক, অধিবাসী বিনিময় করিতেই হইবে। পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের গণপরিষদ্‌দ্বয় এবিষয়ে ভার লইতে পারে এবং পরে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় ও সম্ভব ক্ষেত্রে এই অধিবাসী বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে।]

পাকিস্থানের সংখ্যালঘু অ-মুসলমান অধিবাসীকে ডাকিয়া স্থান দিতে অস্বীকার করে তবে পাকিস্থানের অ-মুসলমানকে হয় চিরকাল শরীয়তের রাষ্ট্রে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, নয় তো বাধ্য হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করিতে হয়। কৌশলে বাধ্য করিয়া ইসলাম (শান্তির) ধর্ম বিস্তারের অসাধু অভিপ্রায় কি এই জাতীয়তাবাদে অন্তর্নিহিত ?

(৩)

ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে জাতিগঠন জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে নাই। এ প্রচেষ্টা বিজ্ঞান-বিরোধী। ঈশ্বর-বিশ্বাসী আস্তিক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক, এই দুই দলের দর্শনের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক ও জড়বাদী সভ্যতার ধরণের বিভিন্নতা ইতিহাসে দেখা যায়। জড়বাদী সভ্যতাও যেমন প্রাচীন আধ্যাত্মিক সভ্যতাও তেমনি প্রাচীন। জড়বাদী আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে জোচ্চুরি, শোষণনীতি আর ধর্মকে মানুষের চিন্তাবৃত্তি পঙ্গু করিবার অস্ত্র বলিয়া গালি দিয়াছে * এবং আধ্যাত্মবাদী নিরীশ্বরবাদীকে মূঢ়, নষ্টচেতা, দুর্মতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। † কিন্তু কোন দর্শনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন রাষ্ট্র বা 'জাতি'গঠনের সম্ভাব্যতা অথবা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে

---

* "Religion is the opium of the people"—Lenin, 'Religion'.

'যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢাংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥'—গীতা ৩।৩২

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥' গীতা ১৬।৮-৯

নাই। নাস্তিকের বিরুদ্ধে অসূয়াপরবশ হইতে নিষেধ করিয়া তাহার আত্মজ্ঞান জন্মানর চেষ্টা করিতে নির্দেশ দিয়াছে আধ্যাত্মিক ধর্ম, আর জড়বাদী চাহিয়াছে যুক্তির (reason) দ্বারা বস্তুগত চিন্তাবৃত্তির সাহায্যে আধ্যাত্মিকতার কুহেলিকা হইতে মুক্ত করিতে ধর্মভীরু ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষকে। এই দুই দর্শনের কোনটাই অপর মতাবলম্বী মানুষকে ত্যাগ করিবার পরামর্শ দেয় নাই, বরং যুক্তিতর্ক ও প্রেমের পথে স্বগোষ্ঠীভুক্ত করিতে চাহিয়াছে সবাইকে। কেহই অপরকে 'কাফের' আখ্যা দিয়া বিদ্বেষবশে সহিংস 'জেহাদ' ঘোষণা করে নাই। কারণ হিংসা ধর্ম বিরোধী ও বিবেক বিরোধী। হিংসা আধ্যাত্মিকতার সর্বনাশ সাধক এবং জড়বাদের 'reason'এর পরিপন্থী।

ধর্ম ও বস্তুনিষ্ঠা দুই ধরণের সভ্যতার পরিপোষক বলিয়া দাবী করিলেও আজের অগ্রগামী বিজ্ঞান জড় ও প্রাণের আপাত-বিরোধ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। শক্তির বাহিরে জড়ের কোন সত্তা আজ বিজ্ঞান স্বীকার করিতে পারিতেছে না। দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মূলাধার এক প্রাণস্পন্দন। উহাকে ঈশ্বরবাদী 'একোঽহম্—দ্বিতীয়ম্'ই বলুক আর বস্তুবাদী 'তরঙ্গ ও স্পন্দন'ই বলুক, বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে মাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। ঈশ্বরবাদী 'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখ' অশ্বত্থের সমতুল্য জগতের ধারণকর্তা এক পরমাত্মা নামে যে অনির্দিষ্ট অব্যক্তের সন্ধান করিয়াছে, আর জড়বাদী বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া বস্তুতান্ত্রিক যুক্তির সাহায্যে আজ যে 'অনিশ্চয়তার' (uncertainty) খোঁজ করিতেছে তাহা প্রায় এক স্থানেই পৌঁছিতে চলিয়াছে। "আজিকার বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগৎ বা objective world ম্লান হয়ে গেছে। বস্তুবাদীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায়ের তলা হতে সরে গেছে।"*

---

* 'নূতন পথে বিজ্ঞান'—বিজয় ব্যানার্জি—১১পৃঃ।

ঈশ্বর ও নিরীশ্বরবাদীর মৌলিক বিরোধ আজ তাই অবসান হইতে চলিয়াছে। আজিকার অগ্রগামী বিজ্ঞান লেবরেটরীতে স্থূল বস্তুর সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, ও-দুইয়ের মধ্যে তফাৎ বড একটা নাই। আজ বিজ্ঞান বলিতেছে, কেহই আফিম দিয়া মানুষকে তন্দ্রাগ্রস্ত করে নাই ; আবার কেহই 'নেষ্টচেতা দুর্মতি' নহে। সকলেই অনির্দেশ্য অনিশ্চযতার অনুগামী। মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান এইভাবে বিজ্ঞান নিশ্চিতরূপে সেতুবন্ধনে যুক্ত করিতে চলিয়াছে। দুনিয়ায আজ আর ধর্মহীন 'কাফেরের' অস্তিত্ব নাই। বস্তুবাদী প্রাচীন আধ্যাত্মিক সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে বসে নাই,—যুক্তিদ্বারা ইহার দর্শনকে শুদ্ধ করিতেছে। আজ আর পংক্তি ভোজনে বাধা নাই।

ধর্মহীন ও ধর্মবিশ্বাসীর মধ্যে যেখানে বিজ্ঞানের ঐক্য দৃঢ় হইতে চলিয়াছে সেখানে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উপাসনা পদ্ধতির দ্বন্দ্ব অন্ধ অজ্ঞানীর মূঢ়তা। ঈশ্বর, পরমাত্মা ও পরকালে বিশ্বাসে যেখানে মিল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত অনির্দেশ্য শক্তিতে বিশ্বাস যেখানে একই সেখানে কে পশ্চিম-মুখো উপাসনা করিল আর কে উত্তর-মুখো হোম-যাগ-যজ্ঞ করিল, কে সমবেতভাবে মিলিত প্রার্থনা করিল আর কে একক ধ্যান করিল, কে নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিল আর কে তাঁহাকে বিশেষরূপে পূজা করিল এ বিচার সম্পূর্ণই নিরর্থক। আজিকার অগ্রগামী বিজ্ঞানের চোখে এ বিরোধ মোটেই ধরা পড়ে না। আবার যাহাদের মোটা নজরে এই অবাস্তব পার্থক্যগুলি বাস্তব প্রতীয়মান হয় তাহাদিগকেও উদ্দেশ করিয়া এক শতাব্দীপূর্বে বাংলার এক যুগাবতারের মুখে সমন্বয়ের বাণী উচ্চারিত হইয়াছে—'যত মত তত পথ।' আর বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই সমন্বয়ের বাণী বহন করিয়াছেন বাঙালী পল্লীব্রতচারী মিলিত প্রার্থনায়।—

"ভগবন হে, খোদাতালা হে,
জয় জয় হে, তব জয় জয় হে—
নহ প্রভু তুমি কভু ভিন্ন হে;
জগৎ জুড়িয়া তব চিহ্ন হে।

* *

সকলেব সনে কর যুক্ত হে;
কর হিংসা কলহ হতে মুক্ত হে—
কব মুক্ত হে কব মুক্ত হে—
জয় জয় হে, তব জয় জয় হে।"

ইসলাম ধর্ম অবলম্বনে অপর ধর্মাবলম্বী মানুষ হইতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবী শুধু যে ধর্মকে জাগতিক ক্ষেত্রে টানিয়া নামায় তাহাই নয়, উহা মানুষের আধ্যাত্মিক বিচ্যুতি ঘটায় এবং মানুষের সাম্য অস্বীকার কবিযা ধর্মেব মূলকে অবজ্ঞা করে। আজ তাই যুগসঞ্চিত সাধনালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যকে অগ্রাহ্য কবিয়া পাকিস্থান জাতীয়তাবাদী একদিকে অন্য সম্প্রদাযকে 'কাফেব' বলিয়া ঐশ্লামিক রাষ্ট্রেব জন্য ধর্মযুদ্ধের জিগীর ছাড়ে† আর অন্যদিকে অপর ধর্মমত-প্রধান দেশকে শত্রুব ও শান্তিহীন দেশ ('দারুল হবব') আখ্যা দিয়া পাকিস্থানেব পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচার চালায়।* এই অন্ধ আবেগেব

---

†"This referendum is a holy war and it is the duty of every muslim to win it"—Raja Gaznafar Ali Khan (about referendum in N. W F. P) Peshwar June 22, 1947. [এই গণভোট আমাদেব ধর্মযুদ্ধ এবং প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য ইহা জয় করা।]

* শ্রীহট্টের গণভোট সম্পর্কে লীগ পক্ষেব পত্রিকাসমূহেব আবেদন—২০ শে জুন হইতে ৭ ই জুলাই পর্যন্ত।

সীমান্ত-গণভোট সম্বন্ধে লীগপক্ষে এইরূপ প্রচাব হয—"Do you want to worship in mpl and become idol worshippers instead of idol breakers or pray in

পরিণতিতে হয় একদিকে নোয়াখালীর মতো হত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতির সহিত ইসলাম ধর্ম প্রচারের উন্মত্ত উল্লাস এবং নারীহরণ ও বলপূর্বক বিবাহের পৈশাচিক তাণ্ডবে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়দান, আর অন্যদিকে প্রতিশোধ গ্রহণের নামে বিহারের ন্যায় নৃশংস কাপুরুষতা। এইভাবে শোধ-প্রতিশোধ চক্রের ঘর্ঘর রবে চলিতে থাকে সারা দেশময় আত্মঘাতী অমানুষিকতার উৎকট, নির্মম অভিযান। ইহার ফলে 'পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ঐশ্লামিক রাষ্ট্র' স্থাপনের স্বপ্ন সফল হইতে পারে, কিন্তু ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা হয় না।

ইতিহাস জানে, ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অনুরূপ চেষ্টা পূর্বে বহুবার বিফল হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জনক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রশাসন বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাইয়া রাষ্ট্রের সমগ্র কাঠামো পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।

(৪)

জাতি হিসাবে ভারতবর্ষে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর আবিষ্কার। ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে সুরু হইয়া গিয়াছে তখন সাম্রাজ্যবাদীর অনুচরগণ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ

---

mosques as ordained in the Holy Quran by the Holy Prophet? If you want the former course then you are at liberty to vote for Hindustan, but if you want to remain faithful to your faith then only the latter course is open to you''--Amritabazar Patrika, Calcutta, June 28, 1947. [আপনি কি মূর্তি ভাঙ্গার বদলে মন্দিরে পুতুল পূজা করিতে চান না পবিত্র কোরাণে বর্ণিত হজরত রসুলের নির্দিষ্ট মতে মসজিদে প্রার্থনা করিবেন? যদি মন্দিরে পূজা করিতে চান তবে হিন্দুস্থানের পক্ষে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু যদি আপন ধর্মে অনুগত থাকিতে চান তবে মাত্র পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দেওয়াই একমাত্র পন্থা।]

আর্কিবল্ডের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় নিজেরা নেপথ্যে থাকিয়া মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আগা খাঁর নেতৃত্বে এক ডেপুটেশন পাঠাইয়া (১লা অক্টোবর, ১৯০৬) তখনকার বড়লাট লর্ড মিণ্টোর মুখ দিয়া ঐ স্বার্থরক্ষার আশ্বাস ঘোষণা করে এবং ভারতীয় মুসলিম লীগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেয় (১৯০৬) *। এই কার্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যে কত উল্লসিত হয় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় লেডী মিণ্টোর ডায়েরীতে। ‡

---

* "But in all these matters I want to remain behind the screen and this move should come from you.........I can prepare and draft the address for you. If it be prepared in Bombay then I can revise it, because I know the art of drawing up petitions in good language. But Nawab Saheb, please remember that if within a short time any great and effective action has to be taken then you should act quickly."—Mr. Archbald to Nawab Mohsin-ul Mulk, dated August 10, 1906 (Quoted in 'India Divided'—P 113) [কিন্তু এসব বিষয়ে আমি যবনিকার অন্তরালে থাকিতে চাই এবং ইহার সূত্রপাত হওয়া উচিত আপনাদের তরফ হইতে। আমি আপনাদের জন্য আবেদন পত্রের খসরা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। খসরাটি যদি বোম্বাই সহরে লেখা হয় তবে আমি উহা সংশোধন করিয়া দিতে পারি কারণ শুদ্ধভাষায় আবেদনপত্র লিখিবার কৌশল আমার জানা আছে। কিন্তু নবাব সাহেব মনে রাখিবেন, অল্প সময়ের মধ্যে মহৎ কিছু যদি কার্যকারীভাবে করিতে হয় তবে আপনাদের তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা দরকার।—নবাব মহসীন উলমুলকের নিকট মিঃ আর্কিবল্ড লিখিত পত্র —১০ই আগষ্ট ১৯০৬।]

‡ "This has been a very eventful day: as someone said to me 'an epoch in Indian history'...........'a very big thing has happened to day. A work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of 62 millions of people (Muslims) from joining the ranks of the seditious opposition." [আজ একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। জনৈক ব্যক্তির কথায়, "ভারত ইতিহাসের একটা যুগসন্ধিক্ষণ।"

সেইদিন হইতে ভারতবর্ষের যাবতীয় জাতীয় সংগ্রামের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ইংরেজ এই মুসলিম-স্বার্থ অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। বাংলার জাতীয় জাগরণ ধ্বংস করিবার মতলবে পরিকল্পিত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সাফাই গাহে লর্ড কার্জন মুসলিম স্বার্থের জিগীর তুলিয়া। তারপর হইতে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজ বণিক পরস্পরে যোগাযোগে এদেশের সমস্ত জাতীয় সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছে, এই ধূয়ার আশ্রয়ে। (১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দের খিলাফৎ আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলার কোন সঙ্গত হেতু নাই)। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের 'সমাজতন্ত্রী' সাম্রাজ্যরক্ষীর নিকটও ধর্মের ভিত্তিতে এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষা মুখ্য হইয়া ওঠে, এবং অনিবার্যগতিতে দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে সে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাজতান্ত্রিক সমাধানের পথ নির্দেশ করে। ভারতে বৃটিশ কেবিনেট মিশন এদেশের নিশ্চিত বিপ্লব প্রতিরোধ করিয়া যায় এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ লইয়া নেতাদের সহিত দীর্ঘ গবেষণায় কালহরণ করিয়া।*

........."আজ একটা বিরাট ঘটনা ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় ইহা এমন একটি কূট কৌশলের কাজ যাহা ভারতবর্ষ ও ভারতের ইতিহাসকে বহুবৎসর ধরিয়া প্রভাবিত করিবে। এ কাজ ছয়কোটি বিশলক্ষ (মুসলমান) ভারতবাসীকে 'রাজদ্রোহী বিরোধী দলে যোগদান হইতে দূরে টানিবার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়"।]

* (Before the Cabinet Mission went out and when they arrived in India) 'We were confronted with a really dangerous situation. There was in the realm of the Congress a violent revolutionary sentiment. The Cabinet Mission found that there was a swing to the extreme and a demand for revolutionary methods to acheive full independence.........We did succeed in one objective, at any rate, and that was the dispersal of the element of suspicion that was in the Indian minds against the British Government. That was of very great importance in enabling the relationship between this country and India to

মুসলিম-স্বার্থ জাতীয়তাবাদ হিসাবে বাস্তব রাষ্ট্রীয় রূপ পায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে গৃহীত পাকিস্থান প্রস্তাবের মধ্য দিয়া। সে প্রস্তাবে ভারতে **একাধিক** মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী ঘোষণা হয় এবং এই দাবীর সমর্থনে মুসলমান ধর্মাবলম্বীকে স্বতন্ত্র 'জাতি' বলিয়া প্রচার করা হয। ইহাব জের ধরিয়া পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে 'দুই জাতি' মতবাদ জোরগলায প্রচাব হয় এবং সেই দুই জাতিতত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতিতে পাকিস্থানেব একাধিক রাষ্ট্রের দাবী পরিত্যক্ত হইযা পূব ও পশ্চিম পাকিস্থান জুড়িয়া এক কেন্দ্রীভূত বাষ্ট্র পত্তনেব দাবী প্রধান হইয়া দাড়ায। এই দাবীব সাথে আওযাজ তোলা হয, "এক জাতি, এক নেতা, এক রাষ্ট্র"। এইভাবে মুসলিম বাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় প্রদেশগত সাস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হইযা আন্দোলন এক প্রচণ্ড কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। পাঠানিস্থান দাবীব বিরোধিতায় তাই লীগ-নেতৃত্বেব ঘোষণা হয, সীমান্তেব মুসলমানেরা আগে মুসলমান, পরে পাঠান।*

---

proceed on these lines' (compromise and negotiations)—Lord Pethick Lawrance in the House of Lords on February 26, 1947.

[কেবিনেট মিশন যাত্রা কবিবার পূবে এবং ভারতে পৌছাকালে আমবা একটা প্রকৃত বিপজ্জনক অবস্থাব সম্মুখীন হই। তখন কংগ্রেসেব মধ্যে একটা ভযঙ্কব বৈপ্লবিক প্রবণতা বিদ্যমান। বৈপ্লবিক উপাযে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভেব দাবীতে চবম পন্থার দিকে ঝোঁক কেবিনেট মিশন প্রত্যক্ষ কবে।.........আমরা অন্তত ভাবতবাসীব মন হইতে বৃটিশ সরকারের প্রতি সন্দিগ্ধ মনোভাব নিরসন করিতে কৃতকার্য হই। এই সফলতার মূল্য খুব বেশী, কাবণ,ইহার ফলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে বর্তমান(আপোষ আলোচনার) সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয।]

* "I want the Muslims of the Frontier to understand that they are Muslims first and Pathans afterward"—Mr. Jinnah—July 29, 1947 (United Press)

মুসলমান যে একটা 'জাতি' এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য মিঃ জিন্না বলেন, "আমরা (মুসলমানেরা) আমাদের নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতি, ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য শিল্প ও স্থাপত্য, নামাকরণের রীতি, মূল্যবোধ ও সাম্যজ্ঞান, আইন-কানুন ও নৈতিক মান, প্রথা ও পাজি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং কর্মপ্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া একটা স্বতন্ত্র জাতি। এক কথায় জীবন দর্শন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র।" ‡ কিন্তু সংস্কৃতি সভ্যতা, শিল্পকলা, স্থাপত্য, প্রথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মিঃ জিন্নার কোন গবেষনা কোনমতেই প্রমাণ্য বলিয়া সুধীসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। বরং এই সকল বিষয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ যে সমান তালে পরস্পরে প্রভাবিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে পণ্ডিতেরা তাহাই বলেন। মূল্যবোধ, সাম্যজ্ঞান, আইন কানুন ও নৈতিক মান ইহার কোন বিষয়ে মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা বুদ্ধির অতীত। আজ সকল সভ্য দেশেই এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী এক অথবা একে অন্যের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠটি গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব। প্রাচীন মূল্য ও নীতিবোধ আজ সমগ্র পৃথিবী পুনর্বিবেচনায় নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতেছে। মুসলমান সমাজের যদি শ্রেষ্ঠ কিছু থাকে তবে তাহা সকল পৃথিবী আত্মসাৎ করিবে; উহাকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া উহারই ভিত্তিতে 'জাতি'র অভিমান

‡ "....... ....We (Muslims) are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calender, history and traditions, aptitudes and ambitions—in short, we have our own distinctive outlook on life and of life."—Mr. Jinnah in a letter to Mahatma Gandhi, September 17, 1944. (Quoted) in 'To the Prategonists of Pakistan' edited by Anand T. Hingorani, 1947.—P. 120.)

করিবার সুযোগ তাহার থাকিবে না। আর মুসলমান সমাজের ও ধর্মের মান যদি এই বিষয়ে জগতের অপরাপর সভ্য জাতি হইতে নিম্নস্তরের হয় তবে তাহাকেও আজ উহা বর্জন করিতে হইবে। তথাকথিত বৈশিষ্ট্যের অজুহাতে উহাই আঁকড়াইয়া থাকিলে কল্যাণ বর্ধন হইবে না। নামাকরণ পদ্ধতি এক হইলেই এক জাতি হয় না, কারণ, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামাকরণ পদ্ধতি একই। তাছাড়া বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের নামাকরণ রীতির সাদৃশ্য এতো বেশী যে এই বৈশিষ্ট্যের দাবী বড় একটা টেঁকে না। পঞ্জিকার উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয়তা প্রচার হাস্যাস্পদ। চান্দ্র মাসের গণনা পদ্ধতি আরবীয়গণ হিন্দুর নিকট হইতেই নাকি শিক্ষা করিয়াছিলেন। উহা সত্ত্বেও যে দিন পঞ্জিকার ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন কায়েদে আজম নিজেই তাহা ব্যবহার করেন না। যে চিঠিতে এই সব কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তারিখ দিয়াছেন ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪। বিকল্পেও তাঁহাদের 'বৈশিষ্টপূর্ণ' তারিখ যোগ করেন নাই। এই বিবৃতিতে কায়েদে আজম সত্যের বড় অপলাপ করিয়াছেন তাহা হয় তো তিনি খবরই রাখেন না। সোয়া নয় কোটি মুসলমানের এক ভাষা ও সাহিত্য বলিতে কোন্ ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি মনে করেন? বাংলা, আসাম, ও পূর্ণিয়া ইত্যাদি বিহারের বঙ্গভাষী অঞ্চলের মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চার কোটী। ইহাদের ভাষা বাংলা। অবশিষ্ট পৌণে পাঁচ কোটীর মধ্যে উর্দু, হিন্দী, গুরুমুখী, পাস্তু, বেলুচি, সিন্ধি, গুজরাটী ও মারাঠী ভাষার চল। অথচ এক ভাষা বলিয়া সোয়া নয় কোটী মুসলমানেরউপর উর্দু চাপাইয়া দেওয়া সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত আর কিছু নহে। আজ যে পাকিস্থান কায়েম হইতে বসিয়াছে তাহার মধ্যে কোথায়ও উর্দু ভাষা নাই। এই পাকিস্থানে মুসলমানের সংখ্যা অনধিক পৌণে

পাঁচ কোটী। তাহার মধ্যে তিন কোটীর ভাষা বাংলা, আর পৌণে দুই কোটীর ভাষা গুরুমুখী, পাস্তু, বেলুচি ও সিন্ধি। মুসলমান জাতির ভাষার ঐক্য তাই চূড়ান্ত অসত্য ভাষণ ও অলীক কল্পনা বিলাস। গোষ্ঠী বিচারেও একই কথা। সোয়া নয় কোটী মুসলমান তো নহেই, পাকিস্থানের পৌণে পাঁচ কোটী মুসলমানও এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। বঙ্গভাষী চার কোটী মুসলমান সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের এবং বঙ্গভাষী অমুসলমানের সমগোষ্ঠিভুক্ত।

নেতৃবৃন্দের এই অসত্য প্রচার কেন্দ্রীভূত অ-গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অনিবার্য পরিণতি। তাঁহারা জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত নহেন। তাই মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দেন নিজেদের কাল্পনিক মতবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় মীরাট কংগ্রেসের (১৯৪৬) সভাপতির অভিভাষণে। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমানের পোষাকের বৈষম্য তাহাদিগকে দুই জাতিতে পরিণত করে না। অর্থাৎ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের পোষাক স্বতন্ত্র। এও পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি।

এই উদ্ভট 'দুই-জাতি' মতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস হয় ভারতের হিন্দু-মুসলমানের 'এক-জাতীয়তা' প্রতিপাদনের যুক্তি অবতারণায়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের এক-জাতীয়তাও সেই জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য কংগ্রেসের দাবী প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী যে বক্তৃতা দেন তাহাতেও দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক সীমারেখার মধ্যে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান পৃথক স্বার্থযুক্ত আলাদা জাতি নহে সত্য। কিন্তু তাহারা যে 'এক-জাতি' এ কথাও শুধু বাক্যজালে মানচিত্র ও ইতিহাস অবহেলায় প্রমাণিত হয় না। সেজন্য দরকার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। 'এক জাতি'

মতবাদে সর্বত্র সে সিদ্ধান্তের অভাব। কংগ্রেসে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, এংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, পার্শী আছে, খৃষ্টান আছে ও 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায় আছে; কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে যে সকল কাটুনী মেয়েরা কাজ করে তাহার আট আনা মুসলমান—সবই সত্য।* কিন্তু সমগ্র ভারত যে 'এক-জাতি'ভুক্ত, জাতীয়তা বিচারকালে ভূগোল, নৃতত্ত্ব ও মানচিত্র বাদ দিয়া সে কথা প্রমাণিত হয় না।

---

* "It (the Congress) is what it means—National. It represents no particular community, no particular class, no particular interest. It claims to represent all Indian interests and classes.........From the very commencement Congress had Musalmans, Christians, Anglo-Indians. I might say, all religious sects, creeds are represented upon it more or less fully.........

"The Congress has from its very commencement taken up the cause of the so called 'untouchables.'

"The Congress through its organisation, the all India Spinners Association, is finding work for nearly 50,000 women in nearly 2,000 villages, and these women were possibly 50 percent Musalman women. Thousands of them belong to the so-called 'untouchable' class"—Mahatma Gandhi in the second Round Table Conference.

[কংগ্রেস, যাহাকে বলে 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান, তাহাই। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা স্বার্থের প্রতিনিধি নহে। ইহা ভারতের সকল শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের দাবী করে। প্রারম্ভ হইতেই কংগ্রেসে মুসলমান আছে, খৃষ্টান আছে ও এংলো-ইণ্ডিয়ান আছে। আমি বলিতে পারি, সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতামত কংগ্রেসে মোটামুটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। সুরু হইতেই কংগ্রেস তথা কথিত 'অস্পৃশ্যদের' বিষয় গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস তাহার প্রতিষ্ঠান 'অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এ্যাসোসিয়েশন' মারফৎ প্রায় দুই হাজার গ্রামের পঞ্চাশ হাজার স্ত্রীলোকের রুজির ব্যবস্থা করিতেছে এবং সম্ভবত ইহাদের আট আনা মুসলমান মেয়ে আর হাজার হাজার আছে তথা কথিত 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীর।]

মহাত্মা গান্ধীর এই যুক্তি যদি আর একটু বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তবে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রাখা কঠিন হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে এক কালে ইংরেজ সদস্য ও সভাপতি ছিল। অতএব ইংরেজ ও ভারতবাসী কি একই জাতিভুক্ত ? য়ুরোপ,আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে ভারতের কংগ্রেসের অনুরাগী, সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক অনেকে আছে ; অথবা ভারতীয় শিল্প-পতিদের পরিচালিত কারখানায় বহু বিদেশী (চীনদেশী, ইংরেজ প্রভৃতি) চাকুরী করে। সেইজন্য তাহারা ভারতের 'জাতি'ভুক্ত হইবেই এমন নিয়ম কি হয় ?

জাতীয়তায় বিদেশীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "The introduction of foreigners does not necessarily destroy the nation ; they merge in it. A country is one nation only when such a condition obtains in it..................

"In reality, there are as many religions as there are individuals ; but those are conscious of the spirit of nationality do not interfere with one another's religion. If they do they are not fit to be considered a nation."†

[বিদেশীর আগমনে 'জাতি' বিনষ্ট হয়, এমন কথা নাই। তাহারা ইহার মধ্যে মিশিয়া যায়। একটা দেশের যখন এই ক্ষমতা থাকে তখনই সে 'জাতি' বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য।.........বাস্তবিক পক্ষে যত লোক তত ধর্ম। কিন্তু যাহারা জাতীয়তা বোধ সম্বন্ধে সজাগ তাহারা একে অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। যদি করে তবে তাহারা

† 'Hind Swaraj'—1908. (Quated in 'To the Protagonists of Pakistan'—Preface).

এক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।] এই মানদণ্ডে বিচার করিলে পাকিস্থান জাতীয়তাবাদও অস্বাভাবিক বিবেচনা হয় না। কারণ, বিদেশী যদি মিশিয়া যাইতে অস্বীকার করে, অথবা অপরের ধর্মে অসহিষ্ণু হয় তবে তো তাহারা ভিন্ন 'জাতির' বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

'দুই জাতি' বাদ ও তাহার প্রতিবাদে 'এক জাতি' দাবীর মধ্যে ধর্ম আর ব্যক্তি বা সমষ্টির 'প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষা' (aptitudes and ambitions) ইত্যাদি সংজ্ঞাহীন অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর এতো জোর দেওয়াব ফলে অবৈজ্ঞানিক ধারায় কেবল কলহ সৃষ্টি হইযাছে। স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট মান, যেমন ভাষা সম্ভব ক্ষেত্রে গোষ্ঠীতত্ত্ব এবং মানচিত্র ও ভৌগোলিক পবিবেশ, যদি অবলম্বন করা হয়, তবে এ নির্ভরযোগ্য ও সহজ সিদ্ধান্ত সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের 'এক-জাতি' ও 'দুই-জাতি' মতবাদেব উপর গড়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে 'ভারতীয়' ও 'পাকিস্থান' জাতীযতাবাদ উভয়ই নিশ্চিহ্ন হয়।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতেব বিভিন্ন জাতীয়তা নিরূপিত হইলে পাকিস্থানের 'দুই-জাতি' মতবাদ দানা বাঁধিতে পাবিত না, এবং সারা ভারতেব' এক-জাতি' ও 'দুই-জাতি' লইয়া বিতর্কে ঘুটিঘুরাইয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী তাহার স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে পারিত না। 'এক-জাতি' ও 'দুই-জাতি' তর্কের বিরুদ্ধ আকর্ষণে ভারত সমুদ্র মথিত করিয়া আজ উঠিয়াছে বিদ্বেষের হলাহল। এই হলাহল কণ্ঠে ধারণ কবিয়া জাতিকে রক্ষা কবিতে পারে এমন শিব কোথায়?

ধর্মমতের জন্য ভারতবর্ষের মুসলমান যদি অপর ধর্মাবলম্বী হইতে স্বতন্ত্র 'এক জাতি' হয় তবে পশ্চিম এশিয়ার সকল ('ঐশ্লামিক') দেশ-গুলিকে এক 'জাতি'ভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু মুসলমান প্রধান স্বৈরতান্ত্রিক কাশ্মীর রাজ্যের সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে

পাকিস্থান জাতীয়তাবাদী অত্যধিক ব্যাগ্র।* আর বৃটিশ ভারতের বাহিরের মুসলমান রাষ্ট্রের সহিত ঐক্য স্থাপন পাকিস্থান জাতীয়তা-বাদীর কাছে সম্ভব নহে। কারণ সে সব রাষ্ট্র 'স্বৈরশাসিত অবনত দেশ'।† যুক্তি ও ঘোষণার এই অসঙ্গতি অনিবার্যরূপে পাকিস্থান জাতীয়তাবাদ বিপর্যস্ত করিবে।

(৫)

অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিচারে পাকিস্থানের স্বাতন্ত্র্যের সমর্থনে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা মুসলমান প্রধান অঞ্চলে নাই। ভারতের সকল মুসলমান-গরিষ্ঠ এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের মতো কোন যোগসূত্রও নাই। আবার 'হিন্দুধর্ম বর্ষাধারার আর

---

* জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিম কনফারেন্সের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি চৌধুরী হামিদুল্লা খাঁ ২১ শে মে(১৯৪৭)তারিখে ঘোষণা করেন—"I will take up the sword and fight even the Pakistan Forces if they invde a fully independent and sovereign Kingdom of Kashmir." [আমি এমনকি পাকিস্থান বাহিনীর বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিব যদি তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে।]

ঐদিন আবার মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন, "They (Indian States) must consider as completely independent and free States." [দেশীয় রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বিবেচনা করিতে দিতে হইবে।]

† " As Muslims we the Pathans of the Frontier Province believe ourselves to be akin to the Muslims of the Punjab, and our interests demand an alignment with Pakistan rather than with Afghanistan which is an *'autocratic and backward country*—Khan Golam Mahammed Khan--Lahore, July 28, 1947.

[মুসলমান হিসাবে আমরা সীমান্তের পাঠানেরা পাঞ্জাবের মুসলমানেরা স্বগোত্র বলিয়া বিশ্বাস করি এবং আমাদের স্বার্থের খাতিরে দরকার পাকিস্থানের সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া —'স্বৈরশাসিত অবনত দেশ' আফগানিস্থানের সহিত নয়।]

ইসলাম বারিহীন শুষ্ক মরুভূমির', এই যুক্তির উপর জোর দিলে পূর্ব-পাকিস্থান বানচাল হইয়া যায়। *

পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক জীবন—যেমন, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও যানবাহন ব্যবস্থার সহিত পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানের কোন সংযোগ নাই এবং পরস্পরের নির্ভরশীলও নহে। বাণিজ্যের যে যোগাযোগ আশা করা যায় তাহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সে জন্য রাষ্ট্রীয় ঐক্য নিষ্প্রয়োজন।

পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতি বরং সংলগ্ন অমুসলমান-প্রধান অঞ্চলের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পশ্চিম বাংলার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সহিত পূর্ববাংলা কি ভাবে সংযুক্ত তাহা আগেই আলোচনা হইয়াছে। বাংলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সিন্ধুর অবস্থান পরিবেশের সহিত একেবারেই সংযোগহীন। উভয় অংশের মধ্যে মাত্র তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে, যেমন পারে গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের মধ্যে। এ হিসাবেও পূর্ব পাকিস্থানের সহিত বাংলার অমুসলমান অঞ্চল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনায় পাকিস্থানের সমর্থক ও বিরোধী-গণ উভয়েই আবার এক অবৈজ্ঞানিক অসত্য লোক—বিশ্বাস প্রচার করিয়া থাকেন। তাহা সরকারী রাজস্ব-বিলি-ব্যবস্থা বা বাজেট সংক্রান্ত * *। সরকারী বাজেটে ঘাটতির অজুহাতে পাকিস্থান

---

* "Hinduism is of the monsoon as Islam is of the desert"—El Hamza, 'Pakistan—A Nation' P 45

* * (১) ২৮ শে জুন (১৯৪৭) তারিখে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, "The Province (N. W. F. P.) will meet a disastrous fate if it does not join the Pakistan Constituent Assembly. The three and a half million people of that Province

রাষ্ট্রে বিপর্যয় উপস্থিত হইবে এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়া যাঁহারা জাতীয়তাবাদের বিচার করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। সরকারী বাজেটের কেরামতির স্বরূপ বাদশা খাঁ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন সন্দেহাতীত যুক্তিতে।* সীমান্ত প্রদেশের ঘাটতি বাজেটের

which is economically deficit will not be able to stand even for a few months by themselves"(Associated Press)

[পাকিস্থান গণপরিষদে যোগ না দিলে সীমান্ত প্রদেশ দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে। আর্থিক বিষয়ে এই ঘাটতি প্রদেশের পঁয়ত্রিশলক্ষ অধিবাসী নিজেদের উপর নির্ভর করিয়া কয়েক মাসও টিঁকিতে পারিবে না।]

(২) ৬ই জুন তারিখে মিঃ জি, ডি, বিড়লা একবিবৃতিতে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পাকিস্থানের অসহায়ত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।]

(৩) ১০ই আগষ্ট তারিখে ডাঃ মেঘনাদ সাহা 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে' এক জনসভায় সভাপতিত্ব করিয়া বলেন, "As to the stability of Pakistan as an independent State, Pakistan will fail on economic grounds if not on any other" (Amrita Bazar Patrika, August" 11, 1947) [রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বলা চলে যে আর কোন কারণে না হোক অন্তত অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্থান বানচাল হইবে।]

* "It is wrong to say that Pathanistan will be a deficit State. Today we are carrying on a top heavy capitalist administration where the Governor's post alone costs lakhs of rupees. Besides, other British officials take away a large portion of our Provincial Revenues. If all these high salaries are stopped and we have a planned economy we shall definitely be able to make our Province self-sufficient. *Even if Pathanistan is a weak poor state, under no circumstances we shall sell our independence*" [—Khan Abdul Gafar Khan, June 30, 1947.

[পাঠানিস্থান ঘাটতির দেশ হইবে বলা ভুল। আজ আমরা বহন করিতেছি একটা

অজুহাতে পাঠানিস্থান দাবীর বিরোধিতা যুক্তিহীন ও অসার। বাজেট্ বরাদ্দে ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে রাষ্ট্রে **শাসকের পতন উত্থান হইতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে কেহ সম্মত হয় না।** উপর-ভারী ধনতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র চালিয়া সাজিলেই বাজেটের ঘাটতি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

কোন দেশের দারিদ্র্য স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। উহা সাম্রাজ্যবাদীর মতলববাজী যুক্তি মাত্র। আজ নেপালের স্বাধীনতা স্বাভাবিক, পাঠানিস্থানের স্বরাজ সঙ্গত, দ্রাবিড়িস্থানের স্বাধীনতা যুক্তি সম্মত এবং মণিপুরের স্বায়ত্ব শাসনাধিকারও স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আবার এই সকল স্বাধীন দেশের মধ্যে পরস্পরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৈত্রীবন্ধন অথবা স্বার্থদ্বন্দ্বে যুদ্ধ বিগ্রহও অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়।

সংস্কৃতিগত সংজ্ঞায় নিরূপিত জাতীয়তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রতিরোধ সাম্রাজ্যবাদ। বিদ্বেষের ভিত্তিতে বিজ্ঞান অস্বীকার করিয়া স্বাভাবিক পথে জাতীয় সত্ত্বা বিকাশে বাধা দেওয়াও মতলববাজের শোষণ নীতি। পাকিস্থান জাতীয়তাবাদ এই বিচারে অস্বাভাবিক এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মতোই সাম্রাজ্যবাদ মূলক।

পাকিস্থানে ভারত বিভাগে ভারতীয় মুসলমানের রাষ্ট্রীয় ঐক্যও স্থাপিত হয় না। সোয়া নয় কোটি মুসলমানের সাড়ে চার কোটি পড়ে

মাথা-ভারী শাসনযন্ত্র যেখানে এক গবর্ণরের পদই লক্ষ লক্ষ টাকা শোষণ করে, আর অপর বৃটিশ কর্মচারীরা প্রাদেশিক রাজস্বের মোটা অংশ টানিয়া লয়। যদি এই সব মোটা বেতন বন্ধ করিয়া আমরা আর্থিক পরিকল্পনা লইয়া কাজ করি তবে নিশ্চয়ই আমাদের প্রদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিতে পারিব। পাঠানিস্থান যদি দুর্বল গরীব রাষ্ট্রও হয় তথাপি কোন অবস্থাতেই আমরা স্বাধীনতা বিক্রয় করিব না।]

পাকিস্থানের বাহিরের অঞ্চলে। তাহাদের 'স্বার্থরক্ষার' জন্য লোকাপসারনের অসম্ভব যুক্তির বদলে আর এক উৎকট যুক্তি উত্থাপন করা হয়। হিন্দুস্থানের মুসলমানের উপর অত্যাচার হইলে তাহার শোধ লওয়া হইবে পাকিস্থানের অমুসলমানদের উপর—অর্থাৎ জামিন (hostage) নীতি। এ নীতি আদিমযুগে প্রচলিত হয়তো ছিল। কিন্তু মানুষ সভ্যতা বিকাশের সাথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে তাহার ফলে এ নীতি আজ সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত। ইহাতে এক জনের অপরাধের 'শোধ' লওয়া হয় আর এক নিরপরাধের উপর অত্যাচার করিয়া। এই নীতির সুযোগে মতলববাজ পীরপুর রিপোর্টের মতো গণ্ডা গণ্ডা ফিরিস্তি উদ্ভাবন করিয়া সরল শান্তিপ্রিয় জনগণকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিদ্বেষের আগুণ জ্বালাইয়া তুলিতে পারে।

(৬)

সম্প্রতি মিঃ জিন্না এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন (১০ই জুলাই ১৯৪৭), পাকিস্থানে সংখ্যালঘুকে নাগরিকের অধিকার সমেত সর্বপ্রকার অধিকার দেওয়া হইবে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিবৃতি এত ফাঁকা যে ইহাতে পাকিস্থান জাতীয়তাবাদের নীতি নির্দেশের কোনই নূতন প্রচেষ্টা হয় নাই। প্রথমত, এই বিবৃতিতে তাঁহার পূর্বেকার 'দুই জাতি'তত্ত্ব—যাহাতে তিনি দাবী করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান এতই পৃথকভাবাপন্ন যে উভয়ের এক রাষ্ট্রে বসবাস অসম্ভব—তাহা খণ্ডন করিয়াছেন কিনা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, নাগরিকের অধিকার বলিতে মিঃ জিন্না কি বুঝিয়াছেন তাহাও তিনি ঘোষণা করেন নাই। পাকিস্থান সম্বন্ধে লীগ নেতৃবৃন্দ এযাবৎ যাহা প্রচার করিয়াছেন এবং যে উদ্দেশ্যে পাকিস্থান দাবী উত্থাপিত হয় তাহাতে মুসলমানের সামাজিক বিধি ও ইসলাম ধর্মকে

বিপদ-মুক্ত করিবাব জন্য শরীয়তের বিধান অনুসারে রাষ্ট্র স্থাপনের আদর্শ জনসাধারণের নিকট হাজির করা হইয়াছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্র-বিধান রচনায় যদি কেবল 'বিপন্ন ইসলামের' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয় এবং সংখ্যাধিক্যের বলে শরীয়তের নির্দেশ সংগ্রহ হইতে থাকে তবে সেই রাষ্ট্র বিধি-রচনায় অ-মুসলমানের পক্ষে সহযোগিতা করা সম্ভব হয না। আর ইহা সম্ভব না হইল প্রকৃত নাগরিকের অধিকার অ-মুসলমানে লাভ করিতে পাবে না।

পরে এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি দলের নিকট মিঃ জিন্না বলেন (১৩ই জুলাই, ১৯৪৭), যে, ধর্মমূলক রাষ্ট্র (Theocratic State) বলিতে কি বুঝায় তাহা তিনি জানেন না তবে গণতন্ত্র তাঁহাদের জানা ১৩০০ বৎসর পূর্ব হইতেই। কাবণ ইসলামই গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়াছে।* এই প্রকাব ভাঁওতার সাহায্যে গণতন্ত্রের নামে শরীয়তের বাষ্ট্র স্থাপনের ইঙ্গিতই মিঃ জিন্নার বিবৃতিতে স্পষ্ট। কাবণ জনসাধারণের নেতৃত্বে তাঁহাব আস্থা নাই।† অতএব সাধারণ লোক বা 'ছোট লোকের' হাতে বাষ্ট্র পরিচালনাব ক্ষমতা অর্পনের প্রত্যক্ষ

* Q.—will Pakistan be a secular or theocratic State ?

Mr. Jinnah—You are asking me a question that is absurd. I do not know what a theocratic State means..............when you talk of democracy, I am afraid, you have not studied Islam. We learnt democracy thirteen centuries ago.

[প্রশ্ন—পাকিস্থান কি একটা ধর্মনিরপেক্ষ না ধর্মমূলক জাগতিক বাষ্ট্র হইবে ?

মিঃ জিন্না—আপনি আমাকে একটা আজগুবি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ধর্মমূলক বাষ্ট্র কাহাকে বলে আমি জানিনা। যদি গণতন্ত্রের কথা তোলেন তবে আমাব আশঙ্কা আপনি ইসলাম ধর্ম বিষয় অধ্যয়ন কবেন নাই। আমবা গণতন্ত্র শিখিয়াছি তেরশ বছর আগে।]

† "Having regard to the 35 millions of voters, the bulk of whom are

গণতন্ত্র বা 'গণরাজ' তাঁহার কল্পনাতীত। আবার পাশ্চাত্যে প্রচলিত পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রও তাঁহার মতে এদেশে সম্পূর্ণ অচল। * * বাকী একমাত্র শরীয়তে নির্দিষ্ট তের শ' বছর আগে লেখা গণতন্ত্র ছাড়া আর কোন বস্তু কায়েদে আজমের কৃপালাভের যোগ্য নহে।

অ-মুসলমানগণকে যদি এইভাবে কৌশলে নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তবে পাকিস্থানের সংখ্যালঘু জনগণের কর্তব্য হইবে সেই দাসত্বের অবসানে নিজেদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করা।। এই সম্ভাবনার প্রতি তর্জনী তুলিয়া মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইলেও কোন বিরুদ্ধ আন্দোলন বা কার্যকলাপ (sabotage activities) সহ্য করা হইবে না। তবে

totally ignorent, illiterate and untutored, living in centuries-old superstitions of the worst type, thoroughly antagonistic to each other, culturally and socially, the working of this constitution (Government of India Act, 1935) has clearly brought out that it is impossible to work a democratic Parliamentary Government in India"—'Recent speeches and writings of Mr. Jinnah'- -P 86.

[সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও শতাব্দী-সঞ্চিত হীনতম কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে পরস্পরে শত্রুভাবাপন্ন সাড়ে তিন কোটি ভোটদাতার কথা বিচার করিলে দেখা যায় যে এই শাসনতন্ত্র(১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন)নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে ভারতবর্ষে কোন গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসন পরিচালনা অসম্ভব।]

* * "Western democracy is totally unsuited for India and its imposition on India is the disease in the body politic."—Mr. Jinnah's article in the 'Time and Tide, dated January 19, 1940.

[পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং ভারতের উপর উহা চাপানই রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাধি।]

অমুসলমান সংখ্যালঘুর ব্যবস্থা কি হইবে? এ প্রশ্নে ভারতবর্ষের সকল নেতাই নীরব ও বিব্রত। নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজগৃহে 'পবদেশী' ভাবে কোন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন সম্প্রদায় ও জাগ্রত জনসমাজ বাস কবিতে পারে না। রাষ্ট্রের মধ্যে তাহারা বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে বাধ্য। সুরুতেই পাকিস্থান এই বিরোধের সম্মুখীন। ভৌগোলিক অবস্থান ও দেশের অধিবাসীর সমগ্রতার প্রতি নজব না দিয়া কেবল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে যে জাতীয়তাব সৌধ রচনা তাহাব মধ্যে এই স্ববিবোধ অবশ্যম্ভাবী। মিঃ জিন্না ধ্বংসমূলক কার্যকলাপেব বিরুদ্ধে যতই হুঙ্কার ছাড়ুন, জনগণ এই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারে না। বৃটিশ সম্রাজ্যবাদীর সকল অত্যাচাব আস্ফালন ও ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া যে জাতি 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাহিযাছে সে জাতি এই অবোধ হুমকিতে অবনত হইবে না। অন্তর্বিদ্রোহের আগুণ পাকিস্থানেব ধর্মরাজ্য ভস্মীভূত করিবে।

সংখ্যালঘুর স্বার্থবক্ষার প্রতিশ্রুতিদান' অহেতুক মুরুব্বিয়ানার অভিমান। আব সেই প্রতিশ্রুতিতে পরিতুষ্ট, পুলকিত ও নির্ভয় হওয়া সংখ্যালঘুর পক্ষে অপমানজনক অধীনতাস্বীকার ও আত্মহত্যার সামিল। পূর্ববঙ্গের অমুসলমান, বিশেষ-হিন্দু সম্প্রদায় এই অপমান হজম করিতে সমর্থ হইবে না। নাগবিকের অধিকার সাম্যের উপব প্রতিষ্ঠিত। জাত-বংশ বিচারে ন'গরিকের অধিকাব ও স্বার্থ-সংরক্ষণের অঙ্গীকার লাভ সাম্যহীন অধীনতা। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধাবায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় চিবদিন সংখ্যালঘু হিসাবে অবস্থান যে কোন নাগরিকেব পক্ষে অসহনীয়। সংখ্যা গরিষ্ঠকে দলভুক্ত করিয়া একদিন না একদিন রাষ্ট্র পারচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণেব আশা যেথানে নির্মূল নাগবিকের অধিকার সেখানে বিনষ্ট।

(৭)

লোকাপসারণের প্রস্তাব ভারতবর্ষের বর্তমান শিল্পবিস্তার ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অকার্যকরী এবং বাস্তবক্ষেত্রে কথার কথা মাত্র। বিশেষত বাংলাদেশে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অধিবাসী বিনিময়ের কল্পনা অচল ও একেবারেই দিবাস্বপ্ন। লোকাপসারণ নীতি বর্তমান শতাব্দীতে, বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে চালু হইয়াছে। পূর্বে ইহা কেহ শুনে নাই বা কল্পনা করে নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে কৌটীল্য, মনু, পরাশর প্রভৃতি সমাজ বিধানের ভাষ্যকারগণ এই ব্যবস্থার ফতোয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ এই কথা শুনা যাইতেছে এবং য়ুরোপে বাস্তবে অল্প অল্প পরীক্ষিত হইয়াছে। ব্রেণার গিরিবর্ত্মকে জার্মাণ-ইতালীয় সীমানা বলিয়া হিটলার স্বীকার করিয়া লইতেই মুসোলিনী টাইরোল জেলার জার্মাণ অধিবাসীদিগকে জার্মাণ সীমান্তের ওপারে পাঠানর ব্যবস্থা করেন। এই সময় টাইরোলের অধিবাসীর অধিক সংখ্যা ছিল জার্মাণ। পোলাণ্ড দখল করার পর জার্মাণী পোলাণ্ডের পশ্চিম অংশে পোলিশ উচ্ছেদ করিয়া জার্মাণ প্রজা পত্তন করে। আবার হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বজার্মাণীর যে সকল অংশ (ওডার নদীর পূর্বের) পোলাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছে সে অঞ্চল হইতে জার্মাণ উচ্ছেদ করিয়া পোলশদিগকে বসান হইতেছে।

য়ুরোপে এই লোকাপসারণের দায়িত্ব লইয়াছে রাষ্ট্র। এ কার্যে অপহৃত ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্র কতটা সুবিচারে এবং তাহার আর্থিক ক্ষতি সাধন না করিয়া কর্তব্য সমাধা করিতে পারিয়াছে তাহার সঠিক হিসাব নাই। তবে জার্মাণীর পক্ষে যে কাজ সহজ ছিল ভারতবর্ষে আজ তাহা সম্ভব নয়। মানুষকে বাস্তু ছাড়া করায় একটা দুঃখ আছে ; তাহাকে গরু-ভেড়ার মতো খোঁয়ার ও গোয়াল হইতে মাঠে

আব মাঠ হইতে অন্য আস্তানায় তাড়াইয়া লওয়াতে মানুষের আত্মার প্রতি অবমাননা আছে ; আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বিচ্ছেদের বেদনা আছে। তাহা ছাড়া আছে পরিবাবের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয়। এই দুঃখ বেদনা ও অবমাননার ইঙ্গিত কবিয়াই ববীন্দ্রনাথ বলিযাছেন নেশন গঠনের মজ্জাব ভিতরকার দারুণ নিষ্ঠুরতার কথা। সে নিষ্ঠুরতাব ব্যাপ্তি হ্রাস হয় যদি পুনর্বসতিতে অর্থনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজে সম্পন্ন হয। তাহা নির্ভব করে ব্যক্তিব সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উপব। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায, ব্যক্তি-তান্ত্রিক নিয়মে ও কৃষি প্রধান বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকাব স্বীকৃত থাকায রাষ্ট্রেব সহিত ব্যক্তিব সম্পর্ক থাকে নগণ্য। উৎপাদন ব্যবস্থাব উদ্যম যেখানে ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্র সেখানে ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনেব দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রে উদ্যম ও সম্পত্তি বাষ্ট্রেব হাতে থাকায এই অপসারণে ব্যক্তিব অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিবাবণ করিতে রাষ্ট্র সমর্থ হইতেও পাবে।

ভাবতবর্ষে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি এমন সম্পর্কহীন যে, দেশের লোকসংখ্যাব সঠিক সংবাদ সংগ্রহই সম্ভব হয নাই।* দেশের কোথায কতলোক

* "The conditions in which the census was taken in Bengal were so extraordinary that it is difficult to reach any definite conclusion about the true population of the Province in 1941"—Prof. R. A. Fisher, F. R. S.—'Population Data Committee (1944) Report.'"

[এমন সব অ-সাধারণ অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে লোক গণনা করা হয় যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ এ প্রদেশের খাঁটি জনসংখ্যা কত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।]

কি ভাবে জীবনযাপন করে রাষ্ট্র বা সমাজ তাহার খোজ রাখে না। উৎপন্ন পণ্যের ও খাদ্য শস্তের পরিমাণের ফিরিস্তি মাঝে মাঝে সরকারী দপ্তরখানা হইতে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু উহার উপযোগিতা রচনা ক্ষেত্রের মতো সরকারী দপ্তরখানাতেই সীমাবদ্ধ। কত মণ ধান এক 'বছরে' ফসল পাইয়াছে এদেশের কৃষকই তাহার সঠিক হিসাব রাখে না। জাতীয় জীবন-যাত্রার এই গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পূর্ণই অসহায়।

রাষ্ট্রনিরপেক্ষ এই ব্যক্তিতন্ত্রে লাভ-ক্ষতি যুক্তি তর্কের বিষয়। ইহার বদলে সমাজতন্ত্র পত্তন সঙ্গত কি-না সে প্রশ্ন এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় লোকাপসারণ সম্ভব নয়। উহাতে জাতির আত্মিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় অনিবার্য।

অধিবাসী বিনিময়ে প্রকৃতিগত বাধাও দুর্লঙ্ঘ্য। পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যা পৌণে সাত কোটির মধ্যে পৌণে পাঁচ কোটি মুসলমান আর অবশিষ্ট প্রায় দুই কোটি অ-মুসলমান। পাকিস্থানের বাহিরে (নবভারতে) আছে সাড়ে চার কোটি মুসলমান। সম্প্রদায়ভেদে অধিবাসী বিনিময়ে দুই কোটি অমুসলমানকে তাড়াইয়া সাড়ে চার কোটি মুসলমানকে আমন্ত্রণ করিলে বাড়তি আড়াই কোটির ঠাঁই মিলিবে কোথায়? পৌণে সাত কোটির হাঁড়িতে দুবেলা অন্ন চড়ানর সমস্যায় বিব্রত গৃহস্বামীর স্কন্ধে আরোপিত আরও আড়াই কোটির দারিদ্র্য তাহার চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিবে খালি সর্ষের ফুল! আবার পূর্ববঙ্গের ১ কোটি ৩৪ লক্ষ হিন্দুর স্থান হয় কোথায়? পশ্চিম বাংলার দুই কোটির কিছু কম অধিবাসীর অনধিক দেড় কোটি হিন্দু। ৪৪ লক্ষ মুসলমানকে সরাইয়া ১ কোটি ৩৪ লক্ষ হিন্দুকে আশ্রয় দিলে বাড়তি ৯০ লক্ষ মাথা গোঁজে কোথায়? আর পশ্চিম বাংলার হিন্দু যদি তেমন বদান্য হয়ই তবেও এই বাড়তি লোকের হাঁড়ির

ব্যবস্থা করিবে কে ? পশ্চিম বাংলার সাড়ে পনর হাজার বর্গমাইল আবাদী জমি আর সারে উনিশ হাজার বর্গমাইল আবাদযোগ্য জমির উপর এই বাড়তি লোক চাপাইলে প্রতি বর্গ মাইলে লোকের ভিড় হইবে আবাদী জমিতে ১৮৫০ জন আর মোট আবাদযোগ্য জমিতে ১৪৬০ জন (বর্ত্তমানে সেস্থলে আছে সারা বাংলায় যথাক্রমে ১৩৩০ ও ৯৯৫ জন)। দুনিয়া জোড়া অন্ন সংকটের মধ্যে বাংলার এই অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চলে এইভাবে ক্ষুধার্তের ভিড় বাড়ানর অসম্ভব দায়িত্ব গ্রহণ করা কোন অতি-মানব জননেতার পক্ষেও সম্ভব নয়। আর বাংলার বাহিরে ? আসামে লাইন প্রথা, বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, আর উড়িষ্যায় 'শলা বাঙ্গালী' আওয়াজ পূর্ব বাংলার হিন্দুকে অগ্নিকুণ্ডে স্বাগত জানায়।

আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পোন্নতির বর্তমান পর্যায়ে নেতারা লোকাপসারণের চীৎকারে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়নপর কাপুরুষে পরিণত করিতে পারেন, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব নিরাপত্তার জন্য সচেতন করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থপর বানাইতে পারেন ; কিন্তু সমাজের কল্যাণ সাধন তাহাতে হয় না।

লোকাপসারণের জন্য আমাদের রাষ্ট্র কী দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ ? বড় জোর পাচ দশখানা স্পেশ্যাল ট্রেণ বাঁধাধরা লৌহ পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত করাইতে পারেন। তাহার মধ্যে পালে পালে আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী ভিটামাটী ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়িয়া গুদাম-জাত হইতে পারে নিরুদ্দেশের যাত্রাপথে। রেলগাড়ীর দুইধারে হেণ্ডেল ধরিয়া চলিবে আর একদল যুবক ও বালক। তাহাদের কতক জলহাওয়ায় শিথিলমুষ্টি হইয়া ও সিগ্‌নেল্‌ পোষ্টের ধাক্কায় মহাযাত্রা সমাপ্ত করিবে, আর কতক চলিবে নূতন মানস রাজ্যে বসতি স্থাপনের জন্য ! নূতন দেশের

জমির মালিকের 'দাঁও' মারিবার সুযোগের চোটে ছিট্‌কে পড়িবে তাহারা সহর ও গ্রামের রাস্তায়। ঝড়-জল, শীত-রৌদ্র, অনাহার ও ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে ক্রমে একে একে পথের শেষ খুঁজিয়া লইবে। যাহারা তবুও বাকী থাকিবে, কিছুদিন পরে গৃহস্থের ঘরের দরজায় দরজায় ফেন-ভিক্ষা হইবে তাহাদের সম্বল। ওদিকে তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহের আসবাব লুটিয়া লইবে দুর্বৃত্তে ও অভাবগ্রস্তে। অবশেষে সকল দুঃখের অবসান করিবে মহাকাল। সে জাগ্রত প্রহরীর অনুচর উঁই ও কীটে নিশ্চিহ্ন করিবে তাহার পুরাতন ভিটা-বাড়ী; আর নূতন রাজ্যে 'মৃত্যুমাঝে চিতাভস্মে' শেষ হইবে পলাতকের দল মহামারীর কল্যান-স্পর্শে। তারপর—ধীরে ধীরে সকল কাহিনী চলিয়া যাইবে বিস্মৃতির অন্তরালে।

(৮)

পাকিস্থান গণ-পরিষদে পাকিস্থানের 'কায়েদে-আজম্' মহম্মদ আলি জিন্না ভারত-খণ্ডনের প্রাক্কালে (১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭) ঘোষণা করেন, যে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই—ধর্ম মানুষের **ব্যক্তিগত বিষয়**।* এই বর্ক্তৃতায় তিনি ভারতবাসীকে 'এক-জাতি' বলিয়াও

* "While you may belong to one religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the State...........

"...........You will find that in course of time Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, but because that is the *personal faith* of each individual, in the political sense as the Citizens of the *Nation*."

[যে কোন ধর্ম, জাতি বা মতবাদের গণ্ডিতেই আপনি থাকুন না কেন রাজকার্যে উহার কোন সম্পর্ক নাই।.........আপনি দেখিবেন যে কালক্রমে হিন্দু ও হিন্দু থাকিবে না, মুসলমান ও মুসলমান থাকিবে না। একথা ধর্মের অর্থে বলিতেছি না,

বর্ণনা করিয়াছেন * এবং তাঁহার সাত বছরের 'দুই-জাতি' মতবাদ এইভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

পাকিস্থান জাতীয়তার দার্শনিক ভিত্তি পাকিস্থানের পায়ের তলা হইতে নিঃশেষে সরিয়া গিয়াছে।

ইহা বলিতেছি রাজনৈতিক অর্থে, জাতির (রাষ্ট্রের) নাগরিক হিসাবে। কারণ ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস।]

+ Nobody could hold *another nation* of four hundred millions in subjugation or continue to hold for any length of time, but for these" (angularities of majority and minority communities, caste prejudice etc.)

[এই সকল (সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের) সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতির অভিমান না থাকিলে কেহই চল্লিশ কোটি লোকের অপর একটা জাতিকে পদানত করিতে বা বেশীদিন অধীনস্থ রাখিতে পারিত না।]

পরিশিষ্ট

পুস্তকখানি লেখা হয় 'স্বাধীনতা' লাভের পূর্বে। অতএব ইহার বিষয়বস্তু সংগ্রহও হয় 'স্বাধীনতা' লাভের পূর্বেকার ঘটনাবলীর ভিত্তিতে অর্থাৎ 'র‍্যাডক্লিফ'-রোয়েদাদের আগে। সংখ্যাবিষয়ক দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনায় 'র‍্যাডক্লিফ' ফতোয়ার ফলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন—

	র‍্যাডক্লিফ ফতোয়ার আগে	পরে
পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যা	৬,৯০ লক্ষ	৬,৬০লক্ষ
পাকিস্থানে মুসলমানের সংখ্যা	৪,৯৪ লক্ষ	৪,৭৫লক্ষ
পাকিস্থানে অ-মুসলমান জনসংখ্যা	১,৯৫ লক্ষ	১,৮৫ লক্ষ
ভারতীয় য়ুনিয়নে মুসলমানের সংখ্যা	৪,২৭ লক্ষ	৪,৪৬লক্ষ
পূর্ববঙ্গে (শ্রীহট্ট সমেত) অ-মুসলমান জনসংখ্যা	১,৩৪ লক্ষ	১,২৫লক্ষ
পূর্ববঙ্গে মোট জনসংখ্যা	৪,৪০ লক্ষ	৪,২০লক্ষ
পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা	৪৪ লক্ষ	৫৩লক্ষ
পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা	১,৯০ লক্ষ	২,১১লক্ষ
পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ	১৫,৫০০ বর্গ মাইল	১৬,১০০ বর্গ মাইল
পশ্চিমবঙ্গে আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ	১৯,০০০ বর্গ মাইল	২০,৫০০ বর্গ মাইল

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গ
মাইল জমিতে জনসংখ্যা

(ক) বাংলায় অধিবাসী বিনিময় ব্যতীরেকে

(১) আবাদী জমিতে	১,২২৫	১,৩১৫
(২) আবাদ যোগ্য জমিতে	১,০০১	১,০৩০

(খ) বাংলায় অধিবাসী বিনিময়ের পরে

(১) আবাদী জমিতে	১,৮২৫	১,৭৫৮
(২) আবাদ যোগ্য জমিতে	১,৪৯০	১,৩৮০

সারা বাংলার প্রতি বর্গ মাইল জন সংখ্যা

(১) আবাদী জমিতে	১,১০০
(২) আবাদ যোগ্য জমিতে	৯৯৫

'র‍্যাডক্লিফ' রোয়েদাদে সংখ্যার এই সামান্য অদল বদল সত্ত্বেও এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা দরকার হয় না।